বাস্তবায়নে: রূপান্তর RUPANTAR

দুর্যোগ বার্তা

(ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার'র একটি ইলেকট্রনিক প্রকাশনা)

সম্পাদনা উপদেষ্টা
স্বপন গুহ
রফিকুল ইসলাম খোকন
জন এস. বিশ্বাস

সম্পাদক
ফারুক আহমেদ

সহসম্পাদক
নুসরাত জহির

সহযোগী সম্পাদক
কপিল ঘোষ
মোঃ আঃ হালিম

প্রকাশনায়:
ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার, রূপান্তর

ডিজাইন
মোস্তাফিজুর রহমান

মুদ্রণ:
রূপান্তর প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন লিঃ
২৯/১, শেরে বাংলা রোড, খুলনা।

সম্পাদকীয়

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা সর্বাধিক বিপন্ন। ভৌগলিক অবস্থান, ঘনবসতি, দারিদ্র্যতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি এই বিপদাপন্নতার প্রধান অনুঘটক।

আইপিসিসি'র চতুর্থ মূল্যায়ন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বন্যা, সাইক্লোন, খরা, জলোচ্ছাস এবং নদী ভাঙ্গনের পরিমাণ আগামী ২০-২৫ বছরের মধ্যে অনেক বৃদ্ধি পাবে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ক্রমধারাকে প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত করবে।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহ বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে যেসব সংস্থা দুর্যোগকালীন মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় তাদের সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে সুপার সাইক্লোন 'সিডর'- এর সাড়াপ্রদান কর্মসূচীতে এর অভাব প্রচন্ডভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। সিডরের সময়ই পরিলক্ষিত হয়- উন্নয়ন সংগঠন যারা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত তাদের আরও কার্যকরভাবে মানবিক সহায়তা প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টিতে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

রূপান্তর বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে ওঠা একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। রূপান্তর উন্নয়নকে সমন্বিত ধারায় প্রবাহিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রূপান্তর উপকূলীয় অঞ্চলের দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামোগত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরমধ্যে ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরের সুপার সাইক্লোন 'সিডর' এবং ২০০৯ সালের ২৫ মে'র সাইক্লোনিক স্টর্ম 'আইলা' কবলিত এলাকায় মানবিক সহায়তা উল্লেখযোগ্য।

দুর্যোগ কর্মকান্ডের এমনি ধরণের কাজের ধারাবাহিকতায় রূপান্তর সম্প্রতি পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর আওতায় 'অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প (৩ পর্যায়)'র কাজ বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্যোগের বিপদাপন্নতাকে বিবেচনায় এনে এই অঞ্চলের ১৫টি এনজিও'র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম 'দুর্যোগ বার্তা' এই কর্মসূচীরই একটি উদ্যোগ। রূপান্তরের 'ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার' থেকে প্রকাশিত এই দুর্যোগ বার্তার প্রথম সংখ্যাটিতে মূলত ঘূর্ণিঝড় 'আইলা কে প্রধান্য দেয়া হয়েছে।

অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে বাংলাদেশের দুর্যোগ প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় এনে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও কৌশল সংক্রান্ত নানা তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ইন্টারনেট ভিত্তিক 'ই-নিউজ লেটার' প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা সচেতনতা সৃষ্টি ও দুর্যোগকেন্দ্রিক যোগযোগ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে।

ই-নিউজ লেটার হিসবে প্রকাশিত 'দুর্যোগ বার্তা'র সূচনা সংখ্যায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী সাইক্লোন 'আইলা'র এক বছর ও আমাদের শিক্ষা, আবহাওয়া বিষয়ক নতুন সতর্ক সংকেতসহ অন্যান্য প্রতিবেদনের পাশাপাশি থাকছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পের ভূমিকা বিষয়ে প্রতিবেদনমূলক আলোচনা।

এই প্রথম সংখ্যায় হয়তো অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে, সকল পাঠকের মতামতের ভিত্তিতে যা আমরা আগামীতে সংশোধনের প্রয়াশ পাবো। এই সংখ্যা প্রকাশনায় যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে অক্সাফাম- এর হিউমেনেটেরিয়ান কোঅর্ডিনেটর কায়সার রিজভি, ওআইসিবি-এর জেসমিন বি হোসেইন, রূপান্তরের-আইটি বিভাগসহ সকল লেখক এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সকলের অব্যাহত সহযাগিতার মধ্য দিয়ে আগামীতে **'দুর্যোগ বার্তা'** আরো সমৃদ্ধ কলেবরে প্রকাশে সক্ষম হবো বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

Oxfam POPI

অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প-এর সৌজন্যে

সূচীপত্র

আইলার ১ বছর – আমাদের শিক্ষা

এই বিশ্লেষণমূলক নিবন্ধটি লিখেছেন ফারুক আহমেদ
পৃষ্ঠা নং-৩

Organizational capacity building through OI-CB Project

এই নিবন্ধটি লিখেছেন নুসরাত জহির
পৃষ্ঠা নং-৬

ভয়াল মানবিক বিপর্যয়ের শিকার আইলা দুর্গত লাখো মানুষ

সরেজমিন বিশ্লেষমূলক প্রতিবেদনটি লিখেছেন শাহাদত হোসেন বাচ্চু
কপিল ঘোষ
পৃষ্ঠা নং-৮

বিবর্ণ লিলি বেগম

ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী গাইবান্ধা জেলার এ কটি কেসস্টাডি
শাকিল আহমেদ
পৃষ্ঠা নং-১৪

পাবনার প্রেক্ষাপট===
কালভেদে দুর্যোগ

এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন আমিনুর রশিদ
পৃষ্ঠা নং-১৫

Climate Change and Bangladesh

মোঃ মিজানুর রহমান
পৃষ্ঠা নং-১৬

Climate Change and Bangladesh

মোঃ সরোয়ার হোসেন
পৃষ্ঠা নং-১৭

দুর্যোগ ও আবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত

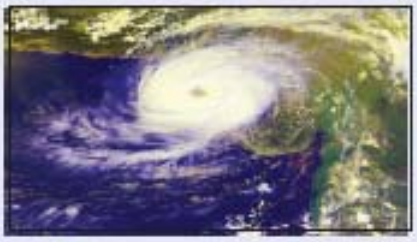

পৃষ্ঠা নং-১৯

দুর্যোগ ও নারী

একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন
সমীর দাস
পৃষ্ঠা নং-২১

আইলার ১ বছর: আমাদের শিক্ষা

ফারুক আহমেদ

আইলার ১ বছর : আমাদের শিক্ষা পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত আছেন খুলনা জেলা প্রশাসক জমসের আহাম্মদ খোন্দকার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সাইফুদ্দিন শাহু, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, প্রেসক্লাব সভাপতি আহমেদ আলী খান এবং নবলোকের নির্বাহী পরিচালক কাজী ওয়াহেদুজ্জামান।

আইলা ; ফিরে দেখা-

২৫ মে, ২০০৯

প্রকৃতির পৃষ্টপোষকতাহীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক সময়ের ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' এবং এর আগের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'। অল্প সময়ের ব্যবধানে 'সিডর' এবং 'আইলায়' বাংলাদেশের উপকূলের কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা, অর্থনীতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ, অবকাঠামো আজ ক্ষতবিক্ষত-বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত-বিপন্ন। বাংলাদেশে এ যাবৎকালের সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী ভিন্ন এক ব্যাকরণের ঘূর্ণিঝড়ের নাম- 'আইলা'। প্রচন্ড রুদ্ররোষে 'আইলা' ধ্বংসযজ্ঞের প্রচন্ডতা দেখিয়েছে ২০০৯ সালের ২৫ মে দুপুরে।

আইলা প্রায় ১০ ঘন্টা সময় নিয়ে খুলনা উপকূল অতিক্রম করে। ঘন্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বাতাসের প্রচন্ডতায় আইলা মাঝারী মাত্রার ঘূর্ণিঝড় হলেও আইলা উপকূলে আঘাত হানার পুরোটা সময়ই আমাবস্যার ভরাজোয়ার ছিল। আমাবস্যার ভরাজোয়ার এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মৌসুমী বায়ু- এই দুয়ে মিলে ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' সীমাহীন নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার প্রচন্ডতায় দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের অস্তিত্বের সবটুকুই নিংড়ে নেয়।

আইলা ধ্বংস করেছে উপকূলের কৃষি, জীবিকা, অর্থনীতি, অবকাঠামো, পরিবেশ-প্রতিবেশ। এর ফলে খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ-পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা প্রভৃতি মৌলিক উৎসের সংস্থান নষ্ট হয়েছে। পরিবেশ স্বাভাবিক বৈচিত্র হারিয়েছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। আইলায় উপকূলীয় অঞ্চলের ১১টি জেলার ৬৪টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সব জেলার মধ্যে খুলনা জেলার দাকোপ এবং কয়রা এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামগনগর উপজেলা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আইলা- ১ বছর পরে :

২৫ মে, ২০১০

গত ১টি বছরেও আইলাদুর্গত এলাকার মানুষের দুর্ভোগের চিত্র খুব একটা পাল্টায়নি। কয়রা-দাকোপ এবং শ্যামনগরের হাজার হাজার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-দুর্গতি,তাদের কষ্ট, অসহায়ত্ব বর্ণনা করা যায় না। শুধু দেখলেই বোঝা যায় আইলার নির্মমতা এবং হিংস্রতা। দীর্ঘ একটি বছর পার হয়ে গেলেও দুর্বল এবং ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনার করুণ শিকার কয়রা-দাকোপ-শ্যামনগরের দুর্গত মানুষ।

হাজার হাজার মানুষ এখনো কার্যত পানিবন্দী। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, উপকূলীয় বাঁধ- অনেকটাই পানির নিচে। গ্রামে গ্রামে বদ্ধপানিতে ময়লা আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ, বিষময় পরিস্থিতি। শিশুদের কষ্ট, নারীদের দুঃখ- একাকার হয়ে সৃষ্টি করেছে অকল্পনীয় দৃশ্য। আবালবৃদ্ধবনিতার এই বছরব্যাপী কষ্ট- চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না।

জীবন-মরণের দোলাচলে দুর্গত মানুষ :

সমুদ্রঘনিষ্ট প্রমত্তা নদী, তার উপর ভঙ্গুর বাঁধ। তার উপর মানুষ। এ যেন জীবন-মরণের দোলাচল। প্রতিদিনের জোয়ারভাটার সাথে জীবনযুদ্ধ। বাঁধের

দুইপাশে নারী-পুরুষ-শিশু, হাজারো মানুষ। সীমাহীন কষ্ট। অসহনীয় দুর্ভোগ। তারপরও মাথা গোজার প্রাণন্ত চেষ্টা। বেঁচে থাকার আকুতি। আইলাদুর্গত মানুষের গত ১টি বছরের রোজনামচা এটি। এমনি বিপদাপন্ন পরিস্থিতিতে চলতি ঘূর্ণিঝড় এবং বৃষ্টির মৌসুমে আরো ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের আশংকায় তারা আশঙ্কিত। সামনে তাদের সীমাহীন অনিশ্চয়তা।

বাঁধ উপাখ্যান :

আইলা ব্যবস্থাপনার চরম ব্যর্থতা বাঁধ নির্মাণে দীর্ঘসূত্রিতা। সময়মত ব্যবস্থা না নেয়ার কারণেই বাঁধ নির্মাণে ১টি বছর অতিবাহিত হলেও এখনো পুরোপুরি সাফল্য আসেনি। ইতিমধ্যে ঘূর্ণিঝড় মৌসুম শুরু হয়ে গেছে। নদীতে পানির চাপ ও উচ্চতা বেড়েছে। এই কারণে বিদ্যমান বাঁধও ঝুঁকিমুক্ত নয়। এছাড়াও যে বাঁধগুলো এখনও মেরামতের চেষ্টা চলছে সেগুলির ভাগ্যও অনিশ্চিত। কয়রা-দাকোপ-শ্যামনগরের মানুষের তাই চোখেমুখে এখনো আইলার হিংস্রতায় ছবি। তারা এখনো অনিশ্চিত তাদের বাড়িঘরে ফেরার ভবিষ্যত নিয়ে।

গত একটি বছরেও দুর্গতদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। দুঃখ যায়নি। দুর্গতি কমেনি। এমনি অবস্থা আরো কতদিন চলবে তারও কোন ইয়ত্তা নেই। গ্যারান্টি নেই। কারণ সেই উপকূলীয় বাঁধ। এই বাঁধই এখন আইলাদুর্গত মানুষের ভবিষ্যত ঠিকানা। বাঁধ যদি টিকে যায় তাহলে আপাতত সময়ের জন্য হলেও দুর্গতি কমবে। আর তা' না হলে আবার ১টি বছরের অপেক্ষা। আর তাই যদি হয় তাহলে রচিত হবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। শুধু তাই নয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক মহলে যে সুনাম অর্জন করেছে তাও জলাঞ্জলি যাবে।

উপকূলীয় বাঁধ-আইলার শিক্ষা :

উপকূলজুড়েই নড়বড়ে ও বিধ্বস্ত বাঁধ। ৬০-এর দশকে তৈরী এ সব বাঁধে গত ৫০ বছরে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন বা যুগের চাহিদা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করা হয়নি। বিবেচনা করা হয়নি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জও। এমনি অবস্থায় আগামীর সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে এই নড়বড়ে ও ভঙ্গুরপ্রায় বাঁধই জীবনের ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এমনি বাস্তবতায় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল ও ভোলাসহ উপকূলীয় জেলাসমূহের ৩৫শ' কিলোমিটার বাঁধের আওতায় বসবাসকারী প্রায় দুই কোটি উপকূলীবাসীর জীবন-জীবিকা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।

উপকূলীয় বাঁধের সংস্কারের অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ যে কত ভয়াবহ হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'। আইলা শিক্ষা দিচ্ছে যে, ৫০ বছর আগে নির্মিত এসব বাঁধ এখন আর মাঝারী পর্যায়ের ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় কোনভাবেই সক্ষম নয়। আর সিডরের ক্যাটাগরির ঘূর্ণিঝড় হলে তো ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা যে কত ভয়াবহ হবে তা' কল্পনা করলেও গা শিউরে ওঠে।

আইলার ১টি বছর অতিক্রান্ত হলেও এই বাঁধগুলি এখনো সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা যায়নি। সময়মত এই বাঁধ নির্মাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা 'পানি উন্নয়ন বোর্ড' চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই ব্যর্থতার জন্যই হাজার হাজার মানুষ গত ১টি বছর বসতভিটার বাইরে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। সময়মত সিদ্ধান্ত নিতে না পারা এবং অতিআনুষ্ঠানিকতার কারণে বিশেষজ্ঞ সংস্থা হিসেবে পরিচিত 'পানি উন্নয়ন বোর্ড' এখনো বাঁধের কাজ শেষ করতে পারেনি।

এমনি বাস্তবতায় গত ১ বছরের কার্যক্রমে বিশেষজ্ঞ এই সংস্থাটির সফলতা কোনভাবে ইঙ্গিত করেনা যে, জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত বিপদজনক পরিস্থিতির 'আসন্ন দুর্যোগ' প্রতিরোধ বা মোকাবেলায় বাংলাদেশের উপকূলজুড়ে বিদ্যমান প্রায় ৩৫শ' কিঃ মিঃ নড়বড়ে বাঁধ উপকূলীয় মানুষের জানমালের সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। বরং উপকূলের মানুষ এখন চরমভাবে আতঙ্কগ্রস্ত এই ভেবে যে, আইলার দুর্ভোগ কাটাতে না কাটাতে যদি আবার জলোচ্ছ্বাস আসে তাহলে তাদের কি হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে উপকূলীয় বাঁধ :

আবহাওয়ার বৈশ্বিক পরিবর্তন এখন আর সময়ের ব্যাপার নয় বরং তা' ঘটমান বর্তমান। আবহাওয়ার এই পরিবর্তন সিডর, নার্গিস এবং আইলায় পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আবহাওয়াবিদরা আশংকা করছেন, ভবিষ্যতের ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা এবং তীব্রতা হতে পারে আরও ভয়াবহ। এর ফলে বিদ্যমান ভগ্নপ্রায় উপকূলীয় বাঁধ এই জলোচ্ছ্বাসের গতিকে হয়ত আটকাতে পারবে না। কারণ বিদ্যমান উপকূলীয় বাঁধের সক্ষমতা ইতিমধ্যে আইলায় প্রমাণিত হয়েছে। মাঝারী মাত্রার ঐ ঘূর্ণিঝড়জনিত জলোচ্ছ্বাসেই খুলনা এবং সাতক্ষীরা অঞ্চলের বাঁধ তছনছ হয়ে যায়। এমনি বাস্তবতায় এরচেয়ে অধিক তীব্রতার জলোচ্ছ্বাসের ভবিষ্যত বাণীতে উপকূলবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছে।

ভবিষ্যতের জলোচ্ছ্বাসকে ঠেকাতে হলে এখনই উপকূল জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনায় এনে যুগোপযুগী বাঁধ দিতে হবে। তা' না হলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে অদূর ভবিষ্যতে খুলনা উপকূলের ৩০ ভাগ এলাকা ডুবে যাওয়ার যে আশংকা করা হচ্ছে তা' খুব দ্রুতই সম্পন্ন হবে যার প্রাথমিক লক্ষণ ইতিমধ্যে খুলনা সর্বদক্ষিণের উপজেলা কয়রার দক্ষিণ বেদকাশী, উত্তর বেদকাশী এবং সাতক্ষীরার গাবুরা ইউনিয়নে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আইলার শিক্ষা :

১. সময়মত বিধ্বস্ত উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণে ব্যর্থতা
২. স্থানীয় রাজনীতিকদের সরকারের শীর্ষমহলে আইলার ভয়াবহতাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে না পারা
৩. প্রধানমন্ত্রীকে 'আইলা বিধ্বস্ত' এলাকায় পরিদর্শনে আনতে না পারা
৪. রাজনীতিকদের আইলাকে ইস্যুতে পরিণত করতে না পারা অথবা এই বিষয়ে রাজনীতিকদের আগ্রহ না থাকা
৫. সরকারের বিভিন্ন মহলের সাথে সমন্বয়হীনতা। বিশেষ করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সাথে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। এছাড়াও ডোনার ও এনজিওদের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়হীনতা

৬. আইলা একটি 'ভিন্ন মাত্রা' এবং 'চারিত্রিক বৈশিষ্টের দুর্যোগ'- এটি বুঝতে না পারা এবং এই ভিন্ন বৈশিষ্টের নেতিবাচক প্রভাব অনুধাবন করে কার্যকর ব্যবস্থা না নেয়া

৭. আইলাবিধ্বস্ত উপকূলজুড়ে কি পরিমাণ মানবিক বিপর্যয় ঘটে চলেছে সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলে সে বিষয়ে ধারণার অভাব

৮. খাবার পানির তীব্র সংকটকে গুরুত্ব না দেয়া- সরকারের এবং এনজিওদের সহায়তার প্যাকেজে 'খাওয়ার পানিকে' কম গুরুত্ব দেয়া

৯. ঘূর্ণিঝড় আইলায় বাতাসের তীব্রতা এবং প্রাণহানি কম হওয়ার সরকার মনে করেছে এটি একটি ছোট আকারের দুর্যোগ। সরকারের পক্ষেই এটি মোকাবেলা সম্ভব। সেজন্য সরকারের পক্ষ হতে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি আইলার আনুষ্ঠানিকভাবে সহায়তার আবেদন না জানানো বা অনেক পরে জানানো।

১০. দাতাদের ঘূর্ণিঝড় সিডরের ন্যায় সহায়তায় এগিয়ে না আসা। এর ফলে মানুষ সিডরের ন্যায় পর্যাপ্ত সহায়তা পায়নি।

১১. আইলার প্রথম পর্যায়ে আইলাকে মিডিয়ায় তেমন গুরুত্ব না দেয়া, সেজন্য আন্তর্জাতিকভাবে আইলা 'হাইলাইটেড' না হওয়া

১২. সার্বিকভাবে আইলার ধ্বংসাত্মক পরবর্তী অবস্থাকে সঠিকসময়ে মূল্যায়নে ব্যর্থ হওয়া এবং 'দুর্গত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা না দেয়ায় মানুষের দুর্ভোগের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করে। পরে যখন সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ সহায়তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় তখন প্রাকৃতিক কারণে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

প্রয়োজন :

- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় এনে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা
- ✓ আইলা পরবর্তী সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে সব কর্মকর্তা বাঁধ নির্মাণে গাফিলতি বা দেরি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
- ✓ আইলাদুর্গত মানুষদের দুর্ভোগকে দীর্ঘ করার কারণগুলি অনুসন্ধান করে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া
- ✓ খসড়া চূড়ান্তকৃত দুর্যোগ আইন বাস্তবায়ন
- ✓ সহজ ও বোধগম্য নতুন যে ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত তৈরী করা হয়েছে তার দ্রুত বাস্তবায়নের ঘোষণা
- ✓ খুলনাঞ্চলে সিপিপি বা ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীকে দ্রুত কার্যকরী করা
- ✓ এসওডি (দুর্যোগ সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশ) বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- ✓ সরকারী ও বেসরকারীভাবে শিশু ও শিক্ষার্থীদের 'বিশেষ ব্যবস্থায়' ধারাবাহিক কার্যক্রমের সূচনা করা যাতে, শিশু ও শিক্ষার্থীরা দুর্যোগের ভয়াবহতা ভুলে শিক্ষা ও আনন্দের ভেতরে তাদের দিনাতিপাত করতে পারে
- ✓ নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যগত উপসর্গ বিশেষকরে প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসা ও সচেতনতা অবিরামভাবে চালিয়ে যাওয়া
- ✓ উপকূলীয় এলাকায় কম্যুউনিটি রেডিওর অনুমোদনে অগ্রাধিকার নির্ধারণ
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের ফান্ড খুলনাঞ্চলে বেশী সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা
- ✓ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিদের আইলা এলাকায় বাস্তবমুখি সহায়তার আহবান
- ✓ বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী পর্যাপ্ত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা
- ✓ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূলস্রোতে নিয়ে আসা
- ✓ এনজিওদের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- ✓ উপকূলীয় এলাকায় পানীয়জলের স্থায়ী উৎস তৈরী করা
- ✓ মিডিয়া এবং গণমাধ্যমকে দুর্যোগ সচেতনতায় আরও বেশী ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা
- ✓ এসওডি অনুযায়ী স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিনিয়ত সভা করা (কমপক্ষে ২ মাসে একবার)
- ✓ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বা ডিআরআর-এর আলোকে ডিএমসি মেম্বরদেরকে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।
- ✓ স্থায়ী বাঁধের জন্য এনজিও এবং নাগরিকদের জড়িত করতে হবে।
- ✓ সাইক্লোন সেন্টারসহ সর্বস্তরের বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ✓ সরকারী ও বেসরকারী সব ধরনের প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✓ এডিপি প্রণয়নের সময় জনগণের ঝুঁকি প্রশমন কৌশলকে সবসময় বিবেচনায় রাখতে হবে।
- ✓ সরকার এবং এনজিও যৌথভাবে আপদকালীন পরিকল্পনা তৈরী করা।

শেষ কথা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'আইলা' থেকে শিক্ষা নিতে না পারলে ভবিষ্যতে চরম মূল্য দিতে হবে। গত ১টি বছরেও আইলাদুর্গদের দুর্ভোগ লাঘবের ব্যর্থতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশে যে সুনাম ছিল আইলায় তাও অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। এমনি অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে ভবিষ্যত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইলার ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। #

লেখক: **ফারুক আহমেদ,** কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী, রূপান্তর ইমেইল: faruque@rupantar.org

(নিবন্ধটি ২৫ মে, ২০১০ সালে খুলনা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত 'আইলার ১ বছর- আমাদের শিক্ষা' শীর্ষক পর্যালোচনা সভায় পঠিত)

Organizational capacity building through OI-CB Project

Nusrat Jahir

We know that, capacity building is a planned, structured sequence of events that may include training, consulting, technical assistance, and mentoring activities. Capacity Building is, however, not limited to international aid work. More recently, capacity building is being used by government to transform community and industry approaches to social and environmental problems.

Capacity Building is much more than training and includes the following:

- Human resource development, the process of equipping individuals with the understanding, skills and access to information, knowledge and training that enables them to perform effectively.
- Organizational development, the elaboration of management structures, processes and procedures, not only within organizations but also the management of relationships between the different organizations and sectors (public, private and community).
- Institutional and legal framework development, making legal and regulatory changes to enable organizations, institutions and agencies at all levels and in all sectors to enhance their capacities.

Capacity building is defined as the "process of developing and strengthening the skills, instincts, abilities, processes and resources that organizations and communities need to survive, adapt, and thrive in the fast-changing world." (Ann Philbin, Capacity Building in Social Justice Organizations Ford Foundation, 1996). One essential mechanism for capacity building is 'partnership development'. Partnerships give a local NGO access to: knowledge and skills; innovative and proven methodologies; networking and funding opportunities; replicable models for addressing community needs and managing resources; options for organizational management and governance; and strategies for advocacy, government relations and public outreach.

Bangladesh threatens to be one of the first, and surely will be one of the major victims of climate change. For the country is extremely vulnerable to climate change-more so perhaps than most other nations on earth. In recent years, we are facing several natural disasters due to climate change. In this regard, we have to prepare ourselves capable to response in CAT-2 level disaster in organizational level. Through the Oxfam International Capacity Building Project, we have a great chance to develop our as well as institutional skills so that we could response in timely and effectively in emergency response management.

Our focus:

- Increased knowledge and skill regarding the standard and procedure of humanitarian response.
- Increased organizational ability to respond in a timely and effective manner.
- Improved access to relevant emergency information to facilitate better coordination for response at local and national level.

Our main objectives:

To be equipped to ensure an effective, timely and appropriate response that is responsive to the particular needs of women and other socially excluded groups.

In recent period, the nature and frequency of natural disaster (cyclone, floods, earthquake etc.) of Bangladesh seems to be changed and brings loss of lives and resources. And when a big disaster occurs, different national, local and international NGO's also comes to work in emergency fields. To make this process more effective and fruitful, Oxfam International (Oxfam GB, Netherlands, Hong Kong and Australia) took the initiative to improve their partner's skills through OI-CB Project. We know that, capacity building is an ongoing process through which individuals, groups, organizations and societies enhance their ability to identify and meet development challenges. So, its a long process and we cannot make us capable in a short times of period. But if we get some technical support and make sure there practices in peace time, then we will be capable to reach our goal.

Conclusion:

Disaster is "an incident that occurs unexpectedly, complex in nature, resulting in the loss of lives and damage to properties and the environment as well as interfering in the daily activities of the local community. The incident requires the management which involves resources, equipment, frequency and extensive manpower from various agencies as well as effective coordination and the possibility of taking complex actions over a long period of time". When a natural disaster occurred, different GO, NGO's, aid agencies and social organization's come to response in emergency field. But, for the lack of capacity many of them cannot response timely and effectively. We have to prepare (trained & equipped) ourselves in humanitarian aspect, so that we will be able to respond quickly and effectively.

Through this Capacity Building Project, Rupantar in coastal area, POPI in haor area and GUK in northern area working as focal partner of Oxfam. They are working with the other ngo's who are Oxfam affiliates. Rupantar is working with 15, POPI with 11 and GUK with 18 organizations all over the country. There are many activities in this project period such as; partner's capacity mapping, support to run three existing Disaster Resource Center, different training, workshop, meeting, communication materials develop, contingency stock creation, day observation collaboration with the local govt. organize simulation etc.

We believe that, through the OI-Capacity Building Project, we would be able to increase our knowledge and skills and would be capale to manage large scale disaster with the coordination with GO and NGO's in local and national level.

Writer : Nusrat Jahir, Disaster Manager, Oxfam International Capacity (Emergency) Bulding Project, RUPANTAR; E-mail: disaster@rupantar.org, nusrat@rupantar.org, shukti1@yahoo.com

ভয়াল মানবিক বিপর্যয়ের শিকার

আইলা দুর্গত লাখো মানুষ

॥ শাহাদত হোসেন বাচ্চু ও কপিল ঘোষ, উপদ্রুত এলাকা ঘুরে এসে ॥

আইলা পরবর্তী বছরব্যাপী ভয়াল মানবিক বিপর্যয়ের শিকার উপকূলের কয়রা দকোপ শ্যামনগর এলাকার মানুষের বর্তমান ভাবনা একটিই, তাঁরা বাঁচবেন কি করে! বাঁধ আর মেরামত হচ্ছে না, তাঁরা জেনে গেছেন ইতিমধ্যেই। আগামী নভেম্বর পর্যন্ত কী হবে ? বাঁধের ওপর বসবাসরত দাকোপ, কয়রা, শ্যামনগরের শত শত অসহায় পরিবার জানেন না, আর কখনো তাদের বাড়ি ফেরা হবে কিনা? আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী চলতি মাসে নিম্নচাপ, ঘূর্ণিঝড় আর তীব্র তাপদহের আশংকার সাথে নতুন করে আইলা দুর্গত দাকোপ, কয়রা এলাকায় বাঁধ ভেঙ্গে ৬৭টি গ্রামের মানুষ ভাসছে। আবারো আইলা ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছাসের মত নতুন বিপর্যয়ের আতংকে দিন কাটাচ্ছে লাখো মানুষ। প্লাবিত গ্রামগুলোর অধিকাংশ মানুষ পুনরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে তুলানামূলক উচুঁ বাঁধে। পুনরায় বাঁধের উপর ঘর তুলবে সে সামর্থ্যও নেই অধিকাংশ পরিবারের।

গত কয়েক দিনে দুই উপজেলায় বেড়িবাঁধ, রিংবাঁধ ও ক্লোজার ভেংগে প্লাবিত হয়েছে ৬৭টি গ্রাম। পানি উন্নয়ন বোর্ড সুত্রে জানা গেছে, ৬০ লাখ টাকা ব্যায়ে ৩২ পোল্ডারেরেই এলাকায় বাঁধ নির্মানের কাজ শেষ হয় মাস খানেক আগে। দায়িত্বে থাকা উপ-সহকারি প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন দাবি করেন, ভেতরকার পানির চাপে বাঁধের এ অংশ ভেঙ্গে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্রোতের গতিবেগ, ঢেউয়ের প্রাবল্য, এসব বিবেচনায় নিয়ে নকশা তৈরী করলে এভাবে বেড়িবাঁধ ভাঙ্গতে পারে না। এলাকার মানুষ মনে করছেন, সরকার বাঁধ নির্মানের কাজে দেরী করেছে। শীতকালে এটি নির্মান করা সহজ ছিল। তখন নদীতে পানির পরিমান ও স্রোত কম ছিল, এখন দুই-ই বেশী। ফলে বাঁধ নির্মান ও টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন।

আইলা দুর্গত এলাকা ১ ধরে প্লাবিত ও মাত্রাতিরিক্ত লবনে আক্রান্ত থাকায় কয়রা, দাকোপ, শ্যামনগর উপজেলায় গত বছর

ফসল হয়নি। এবারো বর্ষা মৌসুম (দুর্যোগ মৌসুম) আসার আগেই এলাকা পুনঃপ্লাবিত হওয়ায় ফসল উৎপাদনের সকল সম্ভাবনাই বুমেরাং হয়েছে। ফলে এই এলাকার মানুষেরা অর্ধাহারে-অনাহারে, নিরাপদ আশ্রয়হীন দিন কাটাচ্ছে পূর্বের মতোই। গত এক বছরে এসব এলাকায় ধানের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ লাখ টন। এখনও উদ্বাস্তুর মত জীবন যাপন করছে প্রায় এক লাখ মানুষ। লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের জন্য উপকূলীয় বেড়িবাঁধগুলোর শতাধিক স্থানে কাটা হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে চারশ' অবৈধ স্লুইচ গেট। আজকের দীর্ঘস্থায়ী মানবিক বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে এটি। বেড়িবাঁধ কেটে কৃষি জমিতে লোনা পানি ঢুকিয়ে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের প্রতিবাদে গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান (সিএসআরএল)-এর পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। খুলনা, সাতক্ষীরা, পিরোজপুর, বরগুণাভিত্তিক ২৮টি সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত সিএসআরএল গত ১ এপ্রিল খুলনা জেলা পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত মানব বন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচী পালনকালে বক্তারা আরো বলেন, লোনা পানির কারণে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি ও গবাদি পশু সেক্টর পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। লাখ লাখ মানুষকে পথের ফকির করে চিংড়ি ঘের মালিকরা কোটিপতিতে পরিণত হয়েছে। আর এ কারণেই দেশের অন্যান্য স্থানে দারিদ্র্য হ্রাস পেলেও উপকূল অঞ্চলে দারিদ্র্য বৃদ্ধির হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিকে একই দিনে পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ নীতিমালা প্রণয়ন করার নামে খুলনাঞ্চলের ঘের মালিকরা সমবেত হয়েছিলেন মৎস্য অধিদপ্তর, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ শ্রিম্প এন্ড ফিস ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার এসোসিয়েশনের যৌথ আয়োজিত এক সম্মেলনে। সেখানে তারা পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষের জন্য নীতিমালা দাবি করেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী বলেন, দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে মৎস্য খাতকে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য অচিরেই পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষ নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। তিনি আরও বলেন, আইলা বিধ্বস্ত এলাকায় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদের উন্নয়নে আট কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই চার কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো ইতিমধ্যেই আশংকা প্রকাশ করেছে যে, কয়রা উপজেলার দুটি পোল্ডারের ৪ টি ক্লোজার এ বছর আর নির্মান করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় বছর পেরিয়েও ১৪/১ এবং ১৩ , ১৪/২ পোল্ডারে ক্লোজার নির্মানে ব্যর্থ হয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। সূত্র মতে, বাঁধ ও ক্লোজার নির্মানের উপযুক্ত সময় চলে গেছে। নদীর পানি যাচ্ছে বেড়ে । এলাকাবাসী মনে করছেন, এখন ক্লোজার নির্মিত হলে তা নষ্ট হবে সহসাই। অলৌকিক কিছু না ঘটলে এ অঞ্চলে মহা বিপর্যয় অব্যাহত থাকবে বলেই মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশবিদরা মনে করছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আগত আরেকটি প্রলয়ের পরে এ এলাকা স্থায়ীভাবে জলের নিচে চলে যেতে পারে। এলাকার অনেকেই জানালেন, সে রকম পরিস্থিতির দেখার জন্য তাঁরা কেউ বেঁচে থাকবেন কিনা !

২০০৯ সালের ২৫ মে উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানা আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্যতম এলাকা খুলনার পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩২ নং পোল্ডার। এ পোল্ডারের আওতায় রয়েছে দাকোপ উপজেলার কামারখোলা ও সুতারখালী ইউনিয়ন।পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, আইলা বিধ্বস্ত বেড়িবাঁধ নির্মান পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কামারখোলা, গুনারী, গোলবুনিয়া, নলিয়ান, জোলিয়াখালি এলাকায় ৩৫ দশমিক ৮৭ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মানের সিদ্ধান্ত নেয় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। এ কাজে মোট বরাদ্দ ধরা হয় ১৮ কোটি ৮ লাখ ৯২ হাজার টাকা। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কর্মকর্তার সাথে ঠিকাদারদের সংখ্যতা, উদাসীনতা, গাফিলতির কারণে বেড়িবাঁধ নির্মানের গতি ছিলো মন্থর।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী, কয়রা ও

দাকোপ উপজেলার ৬২ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ১৫ এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু এর আগেই নির্মানাধীন বাঁধ বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে আইলা দুর্গতরা মনে করেন, সরকার বেড়িবাঁধ নির্মানের কাজে দেরি করেছে । গেলো শীতকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসের মধ্যে এই বাঁধ নির্মান করা অনেক সহজ ছিলো। কারণ তখন নদীতে পানির স্তর ও স্রোতের গতি কম ছিলো। এখন পানি ও স্রোত দুটোই বেশি, তার উপর আবার বর্ষাকাল সমাগত। এ পরিস্থিতিতে বাঁধ নির্মান ও তা টিকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এছাড়া, এসব বাঁধও রয়েছে ঝুঁকির মধ্যে। বাঁধের একপাশে কপোতাক্ষ কিংবা শিবসার মতো খরস্রোতা নদ-নদী, অপরপাশে প্লাবিত গ্রামের পানির ঢেউ, এর উপর আবার ভরা পূর্ণিমায় জোয়ারের পানি বৃদ্ধি-এসব মিলিয়ে অবশিষ্ট বাঁধের অধিকাংশই যেকোন মুহূর্তে নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইতোমধ্যে অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

এরকম পরিস্থিতিতে সরকারী ও বেসরকারী তরফে যে ধরনের সাড়া প্রদান করা হয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র ত্রাণ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অন্যদিকে, বাঁধ নির্মান না হওয়ার কারণে পুনর্বাসন বা জীবিকায়নে যেসব প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে স্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে তা কোন কাজে আসছে না বলে এলাকার অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। আইলা দুর্গত এলাকায় এখন সবচেয়ে বড় সংকটটি হচ্ছে সুপেয় পানি। চারিদিকে পানিতে থৈ থৈ, কিন্তু তাতে মাত্রাতিরিক্ত লবন। সুপেয় পানির জন্যে প্রতিদিন ৫/৬ কিলোমিটার দূর থেকে হেঁটে অথবা নৌকায় গিয়ে পানি সংগ্রহ করতে হয়। আবার অনেক স্থান হতে পানি সংগ্রহের জন্যে ৮-১০ লিটারের ড্রাম প্রতি দিতে হয় ১০/১৫ টাকা।

শ্যামনগর উপজেলার পদ্মপুকুর গ্রামের ষাটোর্ধ বিধবা তুলসী রানীর ভাষায়, এখন শুধুই অপেক্ষা করছেন কখন ভগবান তুলে নিয়ে যাবেন। মরণই তাকে মুক্তি দিতে পারে। আইলার পরের বছর ঘুরে এলো, বাঁধের ওপরই কেটে যাচ্ছে দিন-রাত-মাস। কোন ভবিষ্যত নেই, কোন সাহায্য চাননা, চিকিচ্ছে, ওষুধ কিছুই দরকার নাই, শুধু মাছের ঝোল দিয়ে মাখানো একথালা ভাত খেতে চান মরার আগে। আইলায় সব হারানো বৃদ্ধা তুলসীর আর্তনাদে চৈত্রের দুপুর ভারি হয়ে উঠতে শুরু করলে আস্তে আস্তে সরে আসি।

কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকাশী গ্রামের সীমা রানী মন্ডল শিশু সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে সেই আইলার রাতে সাইক্লোন সেন্টারে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে প্রায় একবছর কেটে গেলো বাঁধের ওপর, বাড়ি ফেরা আর হয়নি। বাড়ি তো নেই। জোয়ার এলেই থৈ থৈ জল, ভাটি নেমে যায়, কোথায় ফিরবেন তাঁরা।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়া সীমা জানালেন দেড় কিলোমিটার দূর থেকে আনতি অয় খাবার জল। বাচ্চাডা গত এক বছর স্কুলি যাতি পারতিছেনা। দশ পরিবারের জন্য একটি পায়খানা। আপনি ভাবতি পারেন, একজন মাইয়ে মানুষ কিভাবে এসব কাজ সারতি পারে। আমাদের কোন ইজ্জত নেই,আব্রু নেই, বলতে বলতে প্রায় বাকরুদ্ধ তিনি ।

সুন্দরবন সংলগ্ন বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের দিনমজুর বিধবা রহিমা (৪৫) আইলার পর থেকেই বাস করছেন বাঁধের ওপরে। তাঁর ছোট্ট বসতঘর এখন জলের নিচে। তিনি জানালেন, এক পিস প্লাস্টিক সিট, তিন পিস বাঁশ, ২৫০ গ্রাম দড়ি আর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ১৮ কেজি চাল , ৪ লিটার জল ছাড়া এ যাবত আর তিনি কিছুই পাননি। তাঁর ১৪ বছরের কিশোর ছেলে পড়া ছেড়ে দিয়ে এখন একটি চিংড়ি ঘেরে কাজ করে। দুবেলা খাওয়া জোটে না। দুই বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবেন, কার কাছে যাবেন তাঁর জানা নাই।

গাবুরা ইউনিয়নের লক্ষ্মীখালী গ্রামের মতিয়ার রহমান মাসখানেক আগে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র থেকে নিজ বাড়িতে ফিরে এসে একটি ছোট্টমাচা-টংঘর করে ওঠেন। স্বামী-স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে তাঁর টানাটানির সংসার। বাড়ির পাশের খাল হতে মাছ ধরে বিক্রি করে কোন রকমে চলে। আধপেটা, কখনো আধাবেলা খেয়ে কাটাতে হয় জীবন। কষ্টে-সৃষ্টে খাবার যদিও জোগাড় করা যায়, কিন্তু জলের সংকট ভয়াবহ।

আশপাশে মাঠ-ঘাট-বিলে যেদিকে চোখ যায় থৈ থৈ পানি, তা লবনের তীব্রতায় মুখে তোলা দায়। একফোঁটা মিষ্টি-বিশুদ্ধ জলের জন্যে একদিন পর পর তাই মতিয়ারের স্ত্রী আর স্কুলপড়ুয়া (প্রায় ১৩ বছর বয়স) মেয়েকে ৪/৫ কিলোমিটার পথ হেঁটে পানি আনতে হয়। এর মধ্যে আবার দু'দিন আগে পূর্ণিমার জোয়ারের পানি আইলায় বিধ্বস্ত বাঁধ গলিয়ে এসে এলাকার গ্রামগুলো পুনরায় প্লাবিত করেছে। আইলার পর ১০ মাস ধইরে যে কী দুর্বিষহ জীবনযাপন কত্তিছি, তা কাউরে কওয়ার নাই। আবার পানি বাড়তিছে -এহন বাঁচার আর কোন পথ দেখতিছি নে...! কথাগুলো বলার সময় মতিয়ার রহমানের কণ্ঠ ভারি হয়ে আসছিল।

আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার প্রতিনিধি আলাপকালে জানান, শুরু থেকেই আইলার সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় সম্পর্কে সরকারী মহলের ঔদাসীন্য ছিল চোখে পড়ার মতো। ঘূর্ণিঝড় অব্যবহিত পরে সরকারের একজন মন্ত্রীর বক্তব্য মনে করালেন তিনি, এ ধরনের ছোটখাট দুর্যোগ মোকাবেলায় আমরাই যথেষ্ট। অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে, সরকারী মহলের ধারণাই ছিলনা কী পরিমাণ মানবিক বিপর্যয় ঘটতে চলেছে গোটা উপকূল জুড়ে।

সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের এরকম দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আইলা দুর্গত এলাকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে আন্তর্জাতিক সংস্থার ওই প্রতিনিধি মনে করেন। তাঁর মতে, বিপর্যয়ের সত্যিকার প্রকৃতি সরকার যখন অনুধাবন করতে শুরু করে তখন পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত কমবেশি ১৬৬ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মানে দীর্ঘসূত্রিতা ও ব্যর্থতা কয়রা, দাকোপ, শ্যামনগরসহ গোটা অঞ্চলকে ঠেলে দিয়েছে ভয়াল অনিশ্চয়তার দিকে। স্বভাবতই এ প্রশ্নের উত্তর এখন কারো কাছেই নেই, এসব লোকায় বসবাসরত অর্ধকোটি হতভাগা মানুষের পরিণতি কী ঘটতে যাচ্ছে ?

গত বছর আক্টোবরে শ্যামনগর, দাকোপ, কয়রা অঞ্চলে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা (অক্সফ্যাম, এ্যাকশন এইড, কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ড্যান চার্চ এইড, মুসলিম এইড, ইসলামিক এইড, সেভ দ্যা চিলড্রেন-ইউকে) পরিচালিত যৌথ জরিপে বলা হয়েছিল, আইলা দুর্গত অঞ্চলের জনগণের চাহিদাগুলো হচ্ছে- এক. বাঁধ নির্মান ও সংস্কার, দুই. ঘর নির্মান ও সংস্কার, তিন. খাদ্য ও জীবিকায়ন, চার. নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পাঁচ. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। ওই জরিপে মন্তব্য করা হয়, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে আইলা দুর্গত মানুষের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪১৮জন। দুর্গত পরিবারের সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৬১৫টি, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে ৯৪ হাজার ৬০৯টি বাড়ি, আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে ৪৮ হাজার ৯৭টি, ৩ হাজার ৪১২ একর জমির ফসল সম্পূর্ন নষ্ট হয়েছে। ২ লাখ ১ হাজার ৯৯২জন মানুষ স্থানান্তরিত হয়ে অন্য এলাকায় চলে গেছেন।

সরকারি প্রাক্কলনের উদ্ধৃতি দিয়ে জরিপে বলা হয়, দুর্গত এলাকায় পুনর্বাসন, নির্মান, উদ্ধারসহ সব রকম সংস্কারের জন্য ১১৪৯ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন। এরমধ্যে সরকারী বরাদ্দের বাইরে ৩১ আক্টোবর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে পাওয়া যায় মাত্র ২০ মিলিয়ন ডলারের সহায়তা।

একই সময়ে সাউথ এশিয়া এ্যাসোসিয়েশন অব পোভারটি এডুকেশন পরিচালিত এক স্ট্যাডিতে বলা হয়, দুর্যোগ কবলিত এলাকায় মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৪৪% কমে গেছে। ৬০ হাজারেরও বেশি লোক এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে জীবিকার আশায়। ১৬৬ কিলোমিটার ধ্বংসপ্রাপ্ত বেড়িবাঁধ নির্মান ও সংস্কার ছাড়া দুর্গত জনগণের পক্ষে ঘরে ফেরা এবং জীবিকায়নে সম্পৃক্ত হওয়া অসম্ভব। এ পরিস্থিতিতে সরকারি ও বেসরকারি তরফে সাহায্যের অপ্রতুলতাও ষ্ট্যাডিতে তুলে ধরা হয়।

আইলা দুর্গত এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী লবনাক্ততায় পুড়ে খাক হয়ে গেছে গাছ-গাছালি। নানা ধরনের চর্মরোগের পাশাপাশি আমাশয়, ডায়রিয়া, জন্ডিস ও পানিবাহিত অন্যান্য রোগ এখন মানুষের নিত্যসংগী। অন্যদিকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এসব অসহায় মানুষেরা। যেমনটি জানালেন, বুড়িগোয়ালীনি ইউনিয়নের অর্পনগাছিয়া গ্রামের সরলাবালা বিশ্বাস(৬০) । আট বছর আগে বিধবা হন তিনি। আইলায় সব হারিয়ে মেয়ে, জামাই ও দু'নাতিকে নিয়ে বাঁধের উপর বাস করছেন বছরকাল ধরে। জামাই কাজের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। অভিযোগ নয় চরম হতাশার সাথে তিনি জানালেন, বাঁধের ওপর কোন নিরাপত্তা নেই। যে যা খুশি তাই করতে পারে। যৌন হয়রানি এখানে খুব সাধারণ ঘটনা। মেয়েরা অনেকটা আব্রুহীন জীবন-যাপন করছে। রাতে ঘুমাতে যাই বটে কিন্তু মেয়ের চিন্তায় সারারাত কাটে নির্ঘুম।

আইলা দুর্গত এলাকার মানুষের সম্ভ্রম, মর্যাদা বলে কোনকিছু এখন আর অবশিষ্ট নেই। যেমনটি জানালেন, একই গ্রামের করুনা রানী মন্ডল। একরাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাঁশের সেতু পেরিয়ে যখন তিনি পায়খানায় ঢুকতে যাবেন তখন পুরুষ কণ্ঠে কাশির শব্দ শুনে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ঘরে ফিরে আসেন। কিভাবে রাত কেটে যায় তিনি জানেন না। কান্না জড়িত কণ্ঠে তিনি জানালেন, মান-সম্মান- আব্রু সব গেছে আমাদের। এখন শুধু বেঁচে আছি তাও কদ্দিন তা কে জানে। ৩ কিলোমিটার দুর থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। তার কাছ থেকে জানা গেলো সবচেয়ে বিপদে পড়েন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে। প্যাড তো দুরের কথা প্রয়োজনীয় কাপড় জোগাড় করা এই এলাকার যুব নারীদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে মর্যাদার সাথে সেবা প্রাপ্তিতে দুর্যোগাক্রান্ত জনগণের অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলির ম্যান্ডেট উল্লেখ করে একটি বেসরকারী সংস্থার নির্বাহী প্রধান বলেন, এক্ষেত্রে বরাবরের মত বাংলাদেশী দুর্গতদের প্রতি তাদের আচরণ ছিল অনেকটাই দায়সারা গোছের। তারা এবার এ বিষয়ে সরকারি অনীহারও সুযোগ নিয়েছেন। নাম না প্রকাশ করার শর্তে ঐ সংস্থার নির্বাহী প্রধান আরো বলেন, ৯০ দশকের পরে দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্ব দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চলগুলোতে অসহায় জনগণ ও তাদের সম্পদ রক্ষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীতে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, দরিদ্র দেশগুলোয় দরিদ্র জনগোষ্ঠির নিরাপদ আবাসন ও জীবিকার জন্য আর্ন্তজাতিক মানবিক সংস্থাগুলো সহায়তা অব্যাহত রাখাসহ কাজ করে যাবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ও বিশেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলোর এই ম্যান্ডেট এবং অঙ্গীকার সিডর বিধ্বস্ত এলাকায় প্রায় উপেক্ষিত থেকেছে। আবাসন, জীবিকায়ন ও পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাগুলো দায় সেরেছে নামমাত্র, পাশাপাশি সরকারি তরফের অনীহাও এক্ষেত্রে একটি বড়ো কারণ বলে তাঁরা মনে করছেন।

মহাবিপর্যয়ের কবলে পড়া এরকম হাজার হাজার পরিবার আইলায় বিধ্বস্ত বেড়িবাঁধের উপরে বছর পার করে দিয়েছেন তারপরেও আদৌ তারা আর বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা সে প্রশ্নের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে,আগামী আরেকটা দুর্যোগে তারা বাঁচবেন কি করে ? গত একবছর আশা-নিরাশার দোলাচালে এসব মানুষের দিন কাটলেও সরকারি বা বেসরকারী তরফে সাড়া ছিলো নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। তারা কেবল শুনে আসছেন ভাঙ্গা ভেড়িবাঁধ আবার নির্মান করা হবে। কিন্তু আরেকটি বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসলেও বাঁধ মেরামতের কাজ সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ড আজ অবধি শুরু করতে পারেনি। মানবিক বিপর্যযের ভয়াল এই রূপ প্রত্যক্ষকারী একজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য : আগামী বছর বিস্তীর্ণ এই এলাকা জুড়ে হয়তো দেখা যাবে জল আর জল। সৃষ্টিকর্তা না করুন, সে রকম দিন যেন না আসে!

লেখক (যৌথভাবে) : শাহাদত হোসেন বাচ্চু, কর্মসূচি সমন্বয়কারী,পিএমএন্ডই বিভাগ, রূপান্তর. Email: bacchu@rupantar.org; কপিল ঘোষ, ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার ম্যানেজার, রূপান্তর. Email: resourcecenter@rupantar.org

লেখাটি সম্পাদনায় : জ্যোতির্ময় মল্লিক, রূপান্তর।

কেস স্টাডি

বিবর্ণ লিলি বেগম

শাকিল আহমেদ

ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর। গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রাম। নদীতীরের এ গ্রামে স্বপরিবারে লিলির বসবাস। পরিবার বলতে, স্বামী মিন্টু মিয়া ও ৪ মেয়ে। দিন কাটে চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার মাঝে। ক্রমাগত নদী ভাঙ্গনের মুখে এ পরিবারটির বর্তমান সম্বল ৩ শতাংশের পৈত্রিক ভিটে আর ৪৫ শতক আবাদি জমি। সংসারের নানা অভাব মেটাতে লিলির স্বামী মিন্টু মিয়াকে রিক্সা চালাতে হয়। দৈনিক যা আয় হয় তা' পারিবারিক নুন্যতম চাহিদার চেয়ে অপ্রতুল। এক পর্যায়ে স্বামীর সাথে আলোচনা করেন লিলি। বাড়ির একটি মাত্র গরু, সেটাও বিক্রি করে দেন। বিকল্প আরো কিছু আয়ের আশায় চলতি মৌসুমে বোরো ধান আবাদের খরচ যোগাড় করেন। একটি গরুর বিনিময়ে এবং গায়ে-গতরে খেটে যদি বছরের খাবারটা ঘরে মজুত করা যায়! পরিবারের সবাই মিলে ফেব্রুয়ারী'১০ মাসে ধান রোপন করেন নিজেদের জমিটুকুতে। সকাল-বিকেল খবর নেয় ফসলের। সবুজ মাঠে তাকিয়ে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

'মা আমাদের দেখে ধানগাছের মাথা দুলছে কেন?'-প্রশ্ন করে মায়ের আঁচল ধরে থাকা মেয়েরা। 'ওই তো- ঘরে উঠতে চায় সেইজন্য...' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সরল উত্তর দেয় প্রায় ত্রিশোর্ধ বয়সের লিলি বেগম। আর কিছু না হোক সারা বছর পেটপুরে ভাত তো খেতে পারবে! রিক্সা নিয়ে সারাদিন মিন্টু মিয়া তো বাইরে বাইরে থাকে, রাতে যখন আসে তখন তো মেয়েরা ঘুমায়। দিনের পর দিন ওদের আধপেটা জীবনের যন্ত্রণা তো আর তাঁকে দেখতে হয়না। এভাবেই বলছিলেন লিলি।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ। ধান পাকার পূর্বেই নদীতে আকস্মিক পানি বৃদ্ধি হয়। তলিয়ে যায় অন্যদের মতো লিলিদেরও ফসল। পানির নিচেয় কয়েকদিন থাকলেই সব ধান পঁচে যাবে। দিশেহারা হয়ে পড়ে। অতঃপর শেষচেষ্টা। যদ্দুর পারে কাঁচাধান কেটে আনে বাড়িতে। কিন্তু তাতে জলপঁচা গন্ধ, চাল আর হয়নি। অনাকাঙ্খিত এই আগাম বন্যায় লিলির পরিবারের সামনের দিনগুলোও যেন বিবর্ণ হয়ে আসে। সেসব দিনের কথা ভেবে উঠোনে পড়ে থাকা পঁচা ধানের দিকে তাকায় লিলি। চোখ দু'টোও ঝাপসা হয়ে আসে!

লেখক: শাকিল আহমেদ, রিসোর্স সেন্টার ম্যানেজার, জিইউকে, গাইবান্ধা

লেখাটি সম্পাদনায় : কপিল ঘোষ, ডিজাস্টার রিসোর্স সেন্টার ম্যানেজার, ওআইসিবি প্রকল্প, রূপান্তর।

প্রেক্ষাপট পাবনা

কালভেদে দুর্যোগ

পরিস্থিতি, প্রভাব, প্রতিরোধ ও প্রতিকার কৌশল

আমিনুর রশিদ

নতুন ভারেঙ্গা, পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নে ১৭টি গ্রাম। এই এলাকার প্রায় অর্ধশত বছরের ঐতিহাসিক দুর্যোগ প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায় আপদের প্রকৃতি এবং পরিবর্তনের নানা ধরন। বন্যা, নদীভাঙ্গন, ঘুর্ণিঝড়, কালবৈশাখী, খরা, অতিবৃষ্টি, ডায়রিয়া, আর্সেনিক, জোয়ার বন্যাসহ হরেক দুর্যোগে এ অঞ্চলের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়েছে বারবার।

দুর্যোগ এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব :

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে যমুনা নদীর কোল ঘেঁষে নতুন ভারেঙ্গা ইউনিয়নের অবস্থান। ইউনিয়নের অভ্যন্তরে যাতায়াতের মাধ্যম দু'টি- বর্ষার সময় নৌকা এবং বাকি সময় হাঁটা। বন্যা হলেই প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষসহ বিভিন্ন গবাদী পশু ও জীবজন্তু, বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, রাস্তাঘাট, হাট-বাজারসহ গোটা অবকাঠামো। কৃষি নির্ভর এ ইউনিয়নের বেশিরভাগ মানুষই দিনমজুর, আর বাকীরা মৎস্যজীবী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠী দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা ও পূর্ব প্রস্তুতির অভাবে প্রায় প্রতিবছর বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের জীবন-জীবিকার মান স্বাভাবিক পর্যায়ে আসতে বরাবরই বাধাগ্রস্ত হয়।

দুর্যোগ আপদ'র প্রকার	সংখ্যা	ব্যপ্তিকাল	বছর
বন্যা	১/২	৪/৫ মাস	১৯৬২
নদী ভাঙ্গন	২	৬/৭ মাস	১৯৬৮
ঘুর্ণিঝড়	১	-	১৯৭১
কালবৈশাখী	২/৩	-	১৯৭৩
খরা	২	৫ মাস	১৯৮৮
অতিবৃষ্টি	২	৪ মাস	১৯৮৯
ডায়রিয়া	২/৩	২ মাস	১৯৯১
আর্সেনিক	-	-	১৯৯৪
জোয়ার ও বন্যা	২	১/২ মাস	১৯৯৮, ২০০৪
জোয়ার ও বন্যা	২	১/২ মাস	২০০৭, ২০০৮

২০০৪ সালে শতকরা ৯৮% বাড়িঘর বন্যায় সম্পূর্ণ ডুবে যায়। এসময় এলাকায় কোন ইঞ্জিনচালিত বোর্ড বা বড় নৌকা ছিলনা। ফলে অন্যত্র থেকে ৪/৫ গুণ বেশি ভাড়া দিয়ে নৌকা এনে স্থানীয় মানুষেরা গবাদিপশুসহ মালামাল নিয়ে উঁচু এলাকা-বড় রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাকা ভবনে আশ্রয় নেয়। এ বন্যায় মারা যায় ৭ জন, আহত হয় ৩০ জন। এছাড়া, ১২টি গরু, ৬৫টি ছাগলসহ অসংখ্য হাঁস-মুরগী মারা যায়। নদীগর্ভে বিলীন হয় ২০টি বাড়ি। ২টি ওয়ার্ডের কাঁচারাস্তা বিধ্বস্ত হয়। ৪১৩২টি পরিবারের ১০,০২৪ জন নারী এবং ১১,০৫৯ পুরষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী, বৃদ্ধ ও শিশুরা। এর সংখ্যা ছিল ২৮৩৬টি পরিবারের নারী ৭০২১ এবং পুরুষ ৭৭৩৮ জন।

ক্ষতির কারণ:

বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় মানুষের সাথে আলাপ করে ওই ক্ষতির যেসব কারণ পাওয়া গেছে, তা হল- ১. এলাকায় কোন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি না থাকা, ২. এলাকায় আপদকালীন মজুদের ব্যবস্থা না থাকা, ৩. উদ্ধারের ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি না থাকা, ৪. এলাকায় দুর্যোগে অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম না থাকা, ৫. সরকারী সহায়তা অপ্রতুল থাকা, ৬. জনবহুল লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় চরের অবস্থান হওয়ায় যাতায়াতের জন্যে একমাত্র নৌকার ওপর করা, ৭. ডাক্তার না থাকা।

সম্ভাব্য প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কৌশল :

- বন্যার পূর্বেই প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন- উদ্ধারের জন্যে ইঞ্জিন চালিত নৌকার ব্যবস্থা রাখা এবং পূর্ব থেকেই আশ্রয়স্থলগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার করে রাখা।
- ক্ষয়ক্ষতি নিরূপনের জন্য জরুরী জরিপ করা।
- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র তৈরী করা।
- দুর্যোগকালীন যাতে লুটতরাজ না হয় সেজন্য প্রশাসনের সাথে যোগযোগ করে পুলিশ টহলের ব্যবস্থা রাখা।
- স্বেচছাসেবী টিমের ওরিয়েন্টেশন করানো এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে সমন্বয় করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় করা এবং এলাকায় দুর্যোগ সচেতনতা বাড়ানো উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বন্যার পূর্বে অসুস্থ, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী মা ও শিশুর তালিকা তৈরী করা এবং বন্যাকালীন উদ্ধার কাজে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া।
- বন্যার সময় নারীদের টয়লেট ব্যবস্থা, ডেলিভারী সমস্যা, হাইজিন ও রান্না সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে শেল্টার ব্যবস্থাপনা করা।
- শুকনা খাবার, বিশুদ্ধপানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যবলেট, শিশুখাদ্য ওআরএস/স্যালাইনসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ রাখা এবং যথাযথ সময়ে কাজে লাগানো।
- জরুরী চিকিৎসকের তালিকা তৈরী করে তাদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

প্রতিবেদক: আমিনুর রশিদ, ডিজাষ্টার লোকাল প্রজেক্ট, বাঁচতে চাই, পাবনা ;১৯.০৫.২০১০

লেখাটি সম্পাদনায় : কপিল ঘোষ, ডিজাস্টার রিসোর্স সেক্টার ম্যানেজার, ওআইসিবি প্রকল্প, রূপান্তর।

Climate Change and Bangladesh

Md. Mizanur Rahman

Bangladesh is a tropical delta with the Southern coastline touching the Bay of Bengal and the mighty Himalayas in the North. By virtue of her location in the world map Bangladesh is a very natural disaster prone area. The different types of disaster like flood, cyclone, seasonal storm, cyclonic storms, tidal surges, droughts, tornadoes, riverbank erosion, earthquake etc occur in Bangladesh regularly and frequently. The most devastating cyclone and flood of the world occur in Bangladesh. A storm surge during a cyclone inundates the coastal area and off shore islands. During the nineteenth and twentieth centuries a dirges number of cyclones and tidal bores visited the coastal districts and off shore islands. The cyclones, originating over the Bay of Bengal on their onward journey towards mainland, whipped up tidal bores overloading vast tracts of land with heavy loss of life besides uprooting trees and homesteads leaving behind trails of devastation. Extensive floods and cyclones greatly affect the marginal population who loss whatever assets they have and suffer from lack of work and wages. The people who live in perennial cyclone and flooded zones have low indicators in all sectors of poverty, health, nutrition and education.

This is the common symptoms of Bangladesh due to the negative impact of global warming and climate change. There are many devastating, tremendous and gigantic cyclone like SIDR, NARGIS, BEZLI and last AILA has hit the coastal belt of Bangladesh. Here we may describe and show the picture of AILA affected areas. The devastating cyclone "AILA" hits the coastal belt region as well as offshore islands of Khulna and Satkhira district with a huge losses and damages of lives of men, cattle, trees, crops, fishes and shrimp gher. This cyclone advents as a giant of the curse for the poor people of these regions. For the adverse effect of AILA there are two lak people are the bondage of water, thousands of shrimp gher are flooded and till now under water, 98% raw made mud houses are fully destroyed, above ten thousand cattle are dead and till now 32 persons especially children and women are died by the cyclone and storm surge. As a result, everything like total water and sanitation options are fully collapsed and infrastructures are fully damaged and destroyed. Many people are migrated from their homesteads. Near about 50,000 people are taken shelter in the cyclone centre and another people are living on the high embankment (veri badth) in the open sky. In brief, the people of these areas are living in the cyclone centre within a miserable, unbearable and unhygienic condition because the total living condition of these areas has been collapsed. I me self along with my staff went round they "AILA" affected area and saw that so many dead body's of men and animals floating on hear and their. The picture of those dreads full and pathetic seen are given below:

App. the total 150-200 men are died, 1200 people especially fishermen are not traced, and 50,000 people are living in the cyclone centre and high places on the road sides according to the evidence of the affected people on the said areas. The scientist and the affected local people believe that it is the negative impact of climate change and in future it will be increased day by day. The current situation of these areas affected by AILA is slightly improved. Till now app. 5,000 people are living in the open sky with a bamboo made house locally known as "khupri" where they are living in misery and painful experience.

Writer : Md. Mizanur Rahman, *Executive Director, Integrated Development Organization (IDO), Jessore-7450, Bangladesh. E-mail:* idobd1993@yahoo.com

Climate Refugee in an unsecured Coast

Md. Sarwar Hossain

Bangladesh coast is frequently affecting by the natural Disaster. After the devastation of Cyclone Sidr many countries came forward along with National and International Organizations to help the sufferers. But after the Aila the relief is not sufficient as per the demand. Even the identification and realization of the problem is not enough to solve the problem. However, the number of dead in Aila is less but there are several topics for anxiety

and worry, such as the loss of property like shelter, poultry, cattle, food-grain etc. While talking with the people of the affected area it reveals that people are now helpless and unsecured. Two reasons are responsible for the sufferings, one Global Climate Change and second, Regional Climate change. Now these days, we often debate on Global Climate Change in favor of it and in against of it. But the fact is that the clarification and prevention of the problem is still Unsolved. Actually, Climate change has always and it will but the human intervention altering the composition of climate system and enhancing the rate of climate change which possessing threat to human life. However, the Global Climate Change is affecting mostly the coastal areas country around the world but the regional climate change influencing and making the situation worse. Even, blaming The Global Climate Change for all sufferings becomes a tradition now these days.

Recent cyclone Aila affected the coastal area of Bangladesh. Many people became homeless, agricultural practice has totally destroyed. In the past the sidr stroked in this area and the storm surge water stayed for 25/30 minutes. After removing the water they took their shelter in land but in the Aila the 22 km embankment was damaged. For cyclone and the storm surge water the people had to go shelter walking in the water at his height or near to head. Among these sufferings, the people came to the safer place and stayed whole night in wet cloths. In next day they had gone to their house through boat but they found their cloths, property etc all washed away by the water. The houses fall down gradually as it were being built with mud. They kept the rice and food in their house also swept away by the devastation. In the first two day, they passed without food. Main crisis came to the front is the crisis of water.

All sorts of people like old, child, and women had to stay in the open place of the roadside, which make the situation worse and could be understand only the sufferers. At present 25 thousand people of Kamarkhola and Sutarkhali union living in the open place under the sky. Some people living in the pre-house making with leave of the tree. Women are living in one cloth. Social security for them is under threat. No existence of Sanitation facility, people have

dug in land for the sanitation and women need to wait til night for the process alongside the river or anywhere else. For the dirty water, the diarrhea has broken out with skin disease. The situation indicates that this is only the begins of sufferings.

Now these days, Cyclone is frequently affecting the Bangladesh coast for global warming. From the cyclone Record (source: Bangladesh Meteorological Department BMD) it reveals that, number of cyclone has reduced in 1991-2006 than 1960-1990. But substantial observation reveals that, number of strong cyclone (Severe strong cyclone with core hurricane intensity) become double in 1991-2006 than 1960-1900. It means that most of the cyclone originated in Bay of Bengal turned into the strong cyclone after 1990. Global sea surface temperature (SST) is responsible for the enhanced number of strong cyclone, there is a positive relation between SST and Cyclone formation. According to IPCC, 2007 all over the world number of strong cyclone is increasing but the number of total cyclone is decreasing with the rising of SST.

Under the Coastal Embankment Project (CEP), 1960 more than thousands sluice gates were built in the southwest Bangladesh. Sediment deposited around the sluice gate of the polder, siltation of riverbed, water logging, excessive flood. Reduction in river depth resulted as a consequences of CEP. The negative impact changed the livelihood pattern of the people. Alternative cultivation practice for Environmental Change introduced after late 1980 such as shrimp cultivation. This practice become popular in polder side area, for cultivating shrimp needs to hold saline water around the year. As a result the soil lost its strength and the embankment fall down for the frequently striking of cyclone and storm surge. Reduction in river water flow due to the curse of Farakka Barrage, Intrusion of Saline Water for rising sea level is making the situation more complex.

After visiting the Aila affected area, Dacope, Khulna it could be comments that, people are unsecured and helpless. Cyclone Aila devastation made the people unsecured in terms of food, shelter etc. In cyclone sidr people died in one

day and struggled one day to survive but due to the open coast people will struggle to survive every day. There is no protection around the coast. No land for agriculture. How many days would people depend on relief? Moreover the relief distributed by the GO and NGO is not sufficient. Rebuilding of embankment is matter of time and money, even in strength less soil its quite difficult to build the embankment without which the rehabilitation of agriculture is impossible. So, what is the fate of these Climate refugees in unsecured cost? People at dacope, Khulan are migrating to other places in search of safer place. The vulnerable condition is forcing them to migrate leaving their own land and property where once they maintained a stable life. In search of safer place, they are migrating but they don't know how they will manage their food, shelter, cloth, education etc. However, they are migrating to survive. Actually, dacope area is now impossible to survive.

The cyclone and storm surge brought the sufferings and the fall of embankment influence to reach into the climax of the sufferings of the people. While investigating the reasons for fall of embankment, have organized two focus group Discussion (FGD) with the local people from different occupation, where people commented that, height of the embankment was not

enough, that's why storm surge came to the area crossing the embankment first, after that the embankment fall down. Due to the shrimp cultivation the soil was too dry, and soil particles were fragmented, as a result the sudden storm surge made it to break down, rebuilding of embankment after sidr was not effective and the value of soil was not fixed according to the distance that's why constructor repaired the embankment with the near side soil as a result the embankment slope was not enough against the storm surge. In past some gate were built illegally to water the shrimp gher, water came to the land and fall of the embankment was first around these gates. Moreover the saline water entered for cultivating the shrimp by some greedy people that made the soil lost its strength. So, the GCC brought the sufferings first and the regional changes for the mismanagement of ours lead the calamity in to the climax. These manmade disasters have destroyed the livelihood of the people of the coastal area. Even the geographical location especially Dacope area is unsuitable for conducting any kind of relief. If these problem persist long time especially Global Climate change will hamper the social security of the respective area. The frequently coming of Cyclone, rising sea level that will inundate the coastal land, will create pressure to force the people migrating and will create more Climate refuge. The increase in terrorist activity in Asia will get favorable condition under the vulnerability of climate change. Therefore, the urgency needs to realize. For rehabilitation of the affected area, need seed and fertilizer supply along with agriculture consultancy among the farmers but first the Embankment has to build around the coastal area for ensuring the security of the coast. The mismanagement of us such as ignorance of the management system after building of bridge, embankment etc have to root out and better management of the country have to ensured in the perspective of local technology and our geological features. Need to evaluate the social value of environment.

The unsolved and uncertain negotiation of climate change issue hampering us and will hamper in future with severe intensity. Need some diplomatic initiative for negotiation and combating the climate change issue. Need the initiative to force the developed countries to cut off CO2 at Least 30-50% within 2025. The more residence time of CO2 will act as committed climate change even emission exited in tolerable range (IPCC 2007). Need special assistance for the developing Countries from the developed countries along with technological transfer for reducing the risk of disaster and adaptation to Global Climate Change. Government has to concentrate more to support the aila affected people where declaration of aila affected area as Emergency and Disaster Prone area is the demand of time. #

Writer: Md. Sarwar Hossain, Research and Communication Coordinator, Ulashi Sreejony Sangha (USS), Jessore, Bangladesh, email: koushikadd@yahoo.com

ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার

নতুন সতর্ক সংকেত

দেশে বিদ্যমান ঘূর্ণিঝড় সতর্কসংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তির বার্তায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই বার্তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য করা এবং দুর্যোগ কোন পর্যায়ে ও কোন এলাকায় এর কি প্রভাব হতে পারে তা' সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচার করাই এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্যে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ও আবহাওয়া অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একসাথে এই পরিবর্তনের কাজ করেছেন।

নতুন পদ্ধতিতে নৌবন্দরের সর্তকসংকেত অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর সমুদ্র বন্দরকেন্দ্রিক ঘূর্ণিঝড় সর্তক সংকেত পদ্ধতিতে বাতাসের গতিবেগ অনুযায়ী সংকেত নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের অনুষঙ্গ হিসেবে আসা জলোচ্ছ্বাসে কোন কোন এলাকায় কত উঁচু প্লাবন হতে পারে তাও ঘোষণা করা হবে। পরিবর্তিত ঘূর্ণিঝড় সতর্কসংকেত ও আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তি নিম্নরূপঃ

দূরবর্তী সতর্ক সংকেত-১ :

এই সংকেতটি দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রযোজ্য। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। এর অর্থ হলোঃ মূলত দূরে গভীর সাগরে ঝড়ো হাওয়ার যে অঞ্চল রয়েছে, যেখানের বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৬১ কিলোমিটার এবং তা সামুদ্রিক ঝড়ে পরিণত হতে পারে। এর ফলে বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে যাবার পরে জাহাজটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে পারে। সংশ্লিষ্টদের সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ সতর্ক সংকেতটি নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য নয়।

দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত-২ :

এটি মূলত ০১নং দূরবর্তী সতর্ক সংকেতের মত দূরবর্তী সমুদ্রের জন্য প্রাযোজ্য। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এর অর্থ হলোঃ দূরে গভীর সাগরে ঝড় সৃষ্টি হয়েছে যেখানের বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। এর ফলে বন্দর এখনই ঝড়ে কবলিত হবে না। তবে বন্দর ত্যাগকারী জাহাজ পথের মাঝে ঝড়ো হাওয়ায় পড়তে পারে। এ সময় মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে হবে যাতে স্বল্প সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারে। এ সতর্ক সংকেতটি নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য।

স্থানীয় সতর্ক সংকেত-৩ :

এই সংকেতটি সমুদ্র বন্দর, উপকূলীয় অঞ্চল ও নদী বন্দরের জন্য প্রযোজ্য হবে। এর অর্থ হলোঃ বন্দর ও বন্দরের আশেপাশের এলাকায় ঘন্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগের ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। ঝড়ো হাওয়ার কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী ৬৫ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নৌযানগুলোকে অতি সত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত-৪ :

এটি সমুদ্র বন্দর ও উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে। বাতাসের সম্ভাব্য গতিবেগ ঘন্টায় ৫১-৬১ কিলোমিটার। এর অর্থ হলোঃ বন্দর ও আশপাশের এলাকা ঘূর্ণিঝড় কবলিত। ঘূর্ণিঝড়ের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার মতো বিপজ্জনক সময় এখনো আসেনি। তবে ১৫০ ফুট এবং এর কম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যে সকল নৌযান ঘন্টায় ৬১ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত ঝড়ো হাওয়া প্রতিরোধে সক্ষম নয় সে সকল নৌযানকে অতিসত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, সমুদ্র বন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ মানে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রিক ভয়াবহ ধরনের ঝড়ের পূর্বাভাস যা উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের এক বিশাল অংশে আঘাত করতে পারে। কিন্তু নদী বন্দরের জন্য স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত ০৪ অর্থ মূলত নির্দিষ্ট এলাকায় অস্থায়ী ঝড় ও কালবৈশাখী সংক্রান্ত পূর্বাভাস যা সমুদ্র উপকূল, উপকূলবর্তী এলাকা এবং দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরসহ দেশের যে কোন এলাকায় আঘাত হানতে পারে।

বিপদ সংকেত-৬ :

এ সময় ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার বেগে ঝড়োহাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর অর্থ হলোঃ মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত-৮ :

এ সময় প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ৮৯-১১৭ কিলোমিটার হতে পারে। এর অর্থ হলোঃ প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন এই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দরে অতি তীব্র ঝড়ো হাওয়া বিরাজ করবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত-৯ :

এ সময় হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১১৮-১৭০ কিলোমিটার হতে পারে। এর অর্থ হলোঃ এটি প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। এ কারণে বন্দর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে এবং নদীতে চলাচলকারী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

মহাবিপদ সংকেত-১০ :

সর্বোচ্চ তীব্রতাসম্পন্ন এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় ১৭১ কিলোমিটার বা আরো বেশি হতে পারে।

এর অর্থ হলোঃ এ সময় অতি প্রচণ্ড তীব্রতাসম্পন্ন বা সুপার সাইক্লোনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রচন্ডতম একটি সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর এলাকায় অতীব তীব্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

নতুন সর্তক সংকেত, আবহাওয়া বার্তা ও দুর্যোগ বার্তার বৈশিষ্ট্য

নদী বন্দরের সংকেত :

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নৌপথে নিরাপদ চলাচল ও জানমাল রক্ষার্থে বিদ্যমান পদ্ধতিতে নদীবন্দরগুলোর জন্য ৪টি সর্তক সংকেত প্রচলিত আছে।

- ✓ এর মধ্যে 'নৌ সর্তকসংকেত- ১' ও 'নৌ হুশিয়ারি সংকেত- ২' ব্যবহার করা হয় কালবৈশাখী ও বর্ষাকালীন ঝড়ো হাওয়ার ক্ষেত্রে।
- ✓ আর 'নৌ বিপদসংকেত- ৩ 'ও 'নৌ মহাবিপদ-সংকেত- ৪' ব্যবহার করা হয় সমুদ্রবন্দরকেন্দ্রিক বড় ঝড় কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে।

✓ সমুদ্রবন্দরকেন্দ্রিক সর্তক সংকেত যখন ১০ নম্বর মহাবিপদ-সংকেতে ওঠে তখন নদীবন্দরে থাকে ৪ নম্বর মহাবিপদ সংকেত।

বর্তমানে সরকার অনুমোদিত নতুন পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য মোট ৬টি সংকেত চালু থাকবে। তবে তাতে ১ ও ২ নম্বর সংকেত থাকবে না। ছয়টি সংকেতের প্রথমটি হবে- 'স্থানীয় সর্তক সংকেত- ৩' । দ্বিতীয়টি হবে 'স্থানীয় হুশিয়ারি সংকেত- ৪'।

✓ এরপর সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে মিল রেখে 'বিপদ-সংকেত ৬' এবং 'মহাবিপদ সংকেত ৮, ৯ ও ১০' প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ শুধু নদীবন্দরের জন্য ৩ ও ৪ নম্বর সংকেতই থাকবে, যা কালবৈশাখী ও বর্ষাকালীন ঝড়ো হাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে।

✓ বড় ঝড় কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সমুদ্র বন্দরের মতোই নদী বন্দরেও বিপদ-সংকেত ৬ এবং মহাবিপদ-সংকেত ৮, ৯ ও ১০ ব্যবহার করা হবে। নতুন পদ্ধতিতে ৫ ও ৭ সংকেত থাকছে না।

✓ উল্লেখ্য, নতুন পদ্ধতিতে নদীবন্দরের জন্য ১ ও ২ নম্বর সংকেত না থাকলেও শীতকালে কুয়াশা ও বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্যতা কমে গেলে নৌ পরিচালনার জন্য এমন সর্তকবার্তা ঘোষণা করা হবে, যাতে সাবধানে চলার নির্দেশ থাকবে।

সমুদ্রের জন্য সংকেত :

✓ প্রচলিত পদ্ধতির ১১টির স্থলে নতুন পদ্ধতিতে সমুদ্র ও সমুদ্রবন্দরের জন্য মোট ৮টি সংকেত প্রবর্তন করা হচ্ছে। এর মধ্যে 'দূরবর্তী সতর্ক সংকেত- ১' ও 'দূরবর্তী হুশিয়ারী সংকেত- ২' শুধু গভীর সমুদ্র এলাকা জন্য।

✓ নদীবন্দরের মতো সমুদ্রবন্দর এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জন্যও ঝড়ের সংকেত শুরু হবে 'স্থানীয় সতর্ক সংকেত- ৩' থেকে। এর পরেরটি হবে 'হুশিয়ারী সংকেত- ৪'।

✓ এরপরের সংকেতটি হবে 'বিপদ সংকেত- ৬'। বিপদ সংকেত- ৬ এর অর্থ, মাঝারি তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় মাঝারি ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। বাতাসের গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৬২-৮৮ কিলোমিটার। উত্তর বঙ্গোপসাগরের সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে হবে।

✓ 'মহাবিপদ সংকেত- ৮' এর অর্থ হচ্ছে প্রচন্ড তীব্রতাসম্পন্ন সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে বন্দরে অতি তীব্র ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে। বাতাসের গতিবেগ হবে ঘন্টায় ৮৯- ১১৭ কিলোমিটার।

✓ ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেয়া হবে তখন, যখন সুপার সাইক্লোনের তীব্রতাসম্পন্ন একটি প্রচন্ডতম সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বন্দর ও সংলগ্ন এলাকায় অতিতীব্র ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝড়ো আবহাওয়া বিরাজ করবে।

দুর্যোগবার্তা :

আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ৪ নং হুশিয়ারি সংকেত প্রচারের পর থেকেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে সর্তক করার জন্য গণদুর্যোগ বার্তা প্রচার করবে। নতুনভাবে সংযোজিত দুর্যোগ বার্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - যে মাত্রার সংকেত প্রচার করা হচ্ছে সেই মাত্রার দুর্যোগে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোথায় কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে এবং নিরাপদে থাকার জন্য করণীয় সম্পর্কেও জনগণকে যথাযথভাবে অবহিত করা হবে। এছাড়া, যেসব দুর্যোগের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয় না সেসব দুর্যোগ সম্পর্কে স্বাভাবিক সময়ে জনগনের করণীয় এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচার করবে।

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে শিশুদের সুরক্ষা-

✓ ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে শিশুরা পায় ভয়, এ সময় তাই পরিচর্যা দরকার হয়
✓ ঝড়ের সংকেত শুনে ব্যস্ত ছুটি সবাই, শিশুর দিকে বেশী নজর রাখুন ভাই
✓ আপনার সন্তান আগামী দিনের বংশধর, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে হয়না যেন সে পর
✓ দুর্যোগে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিশু যেন পায় সমপরিমাণ

দুর্যোগে ব্যক্তিগত পর্যায়ের সতর্কতামূলক কাজ :

✓ প্রতিবছর এপ্রিল হতে মে এবং অক্টোবর হতে নভেম্বর মাসে সতর্ক থাকুন। কারণ এ সময় ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস হতে পারে।
✓ এ সময় শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন।
✓ ঘূর্ণিঝড়ের মহাবিপদ সংকেত পাওয়ার পরপরই বাড়ির মেয়ে, শিশু ও বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ ভবন বা সাইক্লোন শেল্টারে পৌছে দিন।
✓ শিশুদের সতর্ক সংকেতের অর্থ বুঝিয়ে এ সময়ের করণীয়সমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিন।
✓ দুর্যোগ আক্রান্ত শিশুদের প্রতি সহমর্মীতা প্রকাশ করুন
✓ শিশুদের দুর্যোগ থেকে বাঁচার কৌশল গল্পাকারে বলুন
✓ দুর্যোগ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম হয়- বিষয়টিতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করুন
✓ আপনার অতি প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান সম্পদ, শুকনো খাবার, পানিভরা পাত্র, নারিকেল, বইপত্র, জরুরী ওষুধ ইত্যাদি একটি প্যাকেট করে বাড়ির মেঝে বা উঠানে পুঁতে রাখুন।
✓ এ সময় গরু-ছাগল-মহিষ, হাঁস-মুরগী বেঁধে রাখবেন না বরং মুক্ত করে দিন।
✓ জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু শুকনো খাবার এবং পানি পাত্রে রেখে পলিথিনে মুড়ে মাটিতে পুঁতে রাখুন।
✓ টিউবওয়েলের মাথা খুলে ওপরের খোলা মুখ শক্ত পলিথিন দিয়ে ভালভাবে মুড়ে রাখুন।
✓ ফসলের বীজ বস্তায় বা পলিথিনে বেঁধে উঁচু স্থানে রাখুন বা অন্যত্র নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করুন।
✓ মহাবিপদ সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে কালবিলম্ব না করে আশ্রয়কেন্দ্র অথবা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।
✓ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বহণযোগ্য রান্নার চুলা, মোমবাতি, দিয়াশলাই ও কিছু জ্বালানী কাঠ সঙ্গে নিন।
✓ তাৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।

পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রূপান্তর

সূত্র: ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার নতুন সতর্ক সংকেত এবং গণদুর্যোগ বার্তা- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।

দুর্যোগ বনাম নারী : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সমীর দাস

নারী ও পুরুষের দুর্যোগ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ভিন্ন। একজন নারী দুর্যোগের সম্ভাব্যতা টের পয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে আর পুরুষ নির্ভর করে আবহাওয়া বার্তার ওপরে। গ্রামের নারী নিজগৃহে থেকেও দুর্যোগ মোকাবেলায় তার অভিজ্ঞতা এবং সনাতনী জ্ঞান প্রয়োগ করেই পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করে। ঝড়, জলোচ্ছাস ও বন্যার মতো দুর্যোগে খাদ্য সংগ্রহ এবং বিতরণ, সন্তান লালনপালন, পানীয় জল আহরণ, গবাদি পশুপাখির দেখাশোনা এবং বিকল্প খাদ্য অনুসন্ধান করে বৈরী পরিবেশে কোনো রকমে টিকে থাকার সংগ্রামে বিনা অর্থে সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে। এভাবেই দক্ষিণাঞ্চলের নারীরা দুর্যোগে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকির মধ্যে থেকেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতিতে সহজাত সঞ্চয় প্রবণতা, দুর্যোগকালীন নারীর কর্মদক্ষতা এবং দুর্যোগ উপশমে নারীর সহমর্মিতা একটি জনগোষ্ঠীকে মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। এভাবে নারী দুর্যোগে তাদের সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখার পরও নির্মমভাবে পুরুষতন্ত্র এবং লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হন। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি। যা পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করে সমাজের জেন্ডার ভারসাম্য রক্ষা করবে।

মানুষ ও জীবজগতের জন্যই পরিবেশ। পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই একে-অপরের পরিপূরক ও সহযোগী হিসেবে কাজ করে এবং এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয় পরিবেশের ভারসাম্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস দেয়, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের যোগান দেয়। আরো দেয় প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ। একটি সময় ছিলো যখন মানুষ পুরোপুরি প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করতো। প্রকৃতিকে নিজ প্রয়োজন মতো ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের ছিলো না। পরবর্তী সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে আনে। শিল্প বিপ্লব বদলে দেয় জীবনযাপন, বনাঞ্চল ধ্বংস হয়, চাষাবাদের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়, প্রকৃতিকে মানুষ খেয়াল খুশি মতো নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। মানুষের বিভিন্ন পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশের দূষণ ঘটতে থাকে, নষ্ট হয় পরিবেশ ভারসাম্য।

মানুষ যখন যাযাবর জীবন থেকে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক জীবনে প্রবেশ করে তখন থেকেই মাতৃতন্ত্রের অবসান ঘটে, উদ্ভব হয় পিতৃতন্ত্রের। আর এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারী ও প্রকৃতি-পরিবেশ উভয়কেই নিজের কর্তৃত্বে নিয়ে আসে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় তৃতীয় বিশ্বের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের অংশগ্রহণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন এবং নগরায়ন প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশও নষ্ট করছে। অধিক মুনাফা অর্জিত অধিকাংশ চিংড়ী প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় নারী শ্রমিকরা সঠিক মজুরি পাচ্ছেন না। তাদের মজুরি দেওয়াও হচ্ছে কম। অনেক ফ্যাক্টরীতে ৮ঘন্টার পরিবর্তে ১২ঘন্টার কাজ করানো হয়। দেওয়া হয় না সাপ্তাহিক ও মাতৃত্বকালীন ছুটি। পরিবেশবান্ধব শিল্পের অভাবে সারাদেশে একই সাথে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ ও বর্জ্য দূষণের ঘটনা ঘটছে। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নগরবাসী এসব দূষণের শিকার হলেও নারীরা এক্ষেত্রে সরাসরি আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ এসব দূষণ সংঘটনে নারীর কোনো ভূমিকা নেই।

অথচ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে আদিমকাল থেকেই নারীর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নিজ গৃহ ও চারপাশকে সুন্দর রাখতেই নারী প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি অবস্থান করে। কৃষিক্ষেত্র, ফসল তোলার পর তার মাড়াই, গোলাজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন, গৃহস্থালি, সন্তানের পরিচর্যা, পশুপালন, জ্বালানি আহরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনধারায় নারীর ভূমিকাই বেশি। আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের নারীরা জীবন ধারণের জন্য পুরোপুরি পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির যোগানের জন্য তারা পরিবেশের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। গ্রামীণ পরিবারগুলো তাদের নিত্যদিনের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনে প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কে মূল ভূমিকা পালন করে নারী, পুরুষ নয়। তাই যে কোনো পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয়ের প্রভাব নারীর ওপর অনেক বেশি। একারণেই একই প্রাকৃতিক পরিবেশের অংশ হয়েও নারী-পুরুষের তুলনায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থানে থাকে। এ অবস্থান প্রকৃতির তৈরি করে দেয়া নয়। নারী পরিবেশের একটি অংশ হয়ে ওঠায় পরিবেশের দুর্দশার সাথে নারীদের নিজেদের দুর্দশা একাত্ম হয়ে যায়।

বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়নের ফলে প্রভাব আমাদের দেশেও পড়েছে। এর ফলে

বাংলাদেশের ৩০ শতাংশ স্থল ভাগ তলিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। আর সবধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রভাব কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর ওপর বেশি। এদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই নারীরা সংখ্যাগুরু। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবার কারণে সুপেয় পানির অভাব, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নিরাপদ বাসস্থানের সঙ্কটসহ নানা ধরনের নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। **"উত্তপ্ত হচ্ছে পৃথিবী, গলছে বরফ আমাদের প্রস্তুতি কি যথেষ্ট?"** বিশ্ব উষ্ণায়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এসব সঙ্কট মোকাবেলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সময় এখনই। পরিবেশ ও দুর্যোগ বিপর্যয় থেকে নারী অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধারক এবং বাহককে রক্ষার জন্য নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন জরুরি। তাই নারী ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের। আর সরকারের উচিত অবিলম্বে জাতীয় পরিবেশ ও দুর্যোগ নীতিমালা বাস্তবায়ন করা। শুধু নীতিমালার অংশ নয়, নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

দুর্যোগকালে নারীর অবস্থান ঃ

দুর্যোগের সময় নারী ও শিশুরাই সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায়। এর কারণ হচ্ছে শিশুকাল থেকেই মেয়েরা বিশ্বাস করে যে তারা দুর্বল ও অসহায় নিচু স্থান দেয়া হয়। নিচের কারণগুলো দুর্যোগের সময় নারীদের অবস্থান বর্ণনা করে। গৃহকাজে ব্যাপ্ত নারীরা দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার সংবাদ পরে পায়। শিক্ষার অভাবে কখনো কখনো তারা পূর্বাভাস বুঝে না, পরিস্থিতি আঁচ করতে পারে না ফলে নিরাপদ আশ্রয়ের পরিবর্তে ঘরেই থাকে। সমাজ সম্পদ, সন্তান ও গৃহস্থালী পাহারার কাজ নারীর উপর ন্যস্ত থাকে। পূর্বাভাস শুনার সাথে সাথে সে পাশের বাড়িতে সন্তানের এবং মাঠে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খোঁজে বের হয়।

দুর্যোগের সময় পুরুষের অভ্যাস হচ্ছে স্ত্রী, সন্তান ও নির্ভরশীলদের ছেড়ে যাওয়া, যখন বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়, দারিদ্র্যের চাপ বাড়ে পুরুষ বিকল্প কর্মসংস্থানের খোঁজে বের হয়। পুরুষদের জিজ্ঞেস করলে জানায়, পরিবারের ক্ষুধার যন্ত্রণা সইতে না পেরে তারা ঘর ছেড়েছে। কিন্তু নারীরা কি পারে, পুরুষের পক্ষে সহজেই চলে যাওয়া সম্ভব কিন্তু আমরা মা- সন্তান ছেড়ে যেতে পারে না। নারীরা দুর্যোগের সময় সমাজ/পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের চাহিদা মিটায় কিন্তু তাদের মনস্তাত্বিক চাহিদা উপেক্ষা করা হয়।

বন্যার সময়ও নারীর কাজ হ্রাস পায় না। বন্যার পানি বাড়ার সাথে সাথে সে সম্ভাব্য ভয়াবহতা থেকে পরিবারকে রক্ষার জন্য উঁচু আশ্রয়, ভেলা বা নৌকায় স্থানান্তর করে। এছাড়াও ঘরের খুঁটি মজবুত করা, বীজ নিরাপদে রাখা, খাদ্য ও জ্বালানী সংরক্ষণ, পশুর আশ্রয়, সাপের দংশন থেকে বাঁচার ব্যবস্থা, অসুস্থ ও শিশুদের যত্ন ইত্যাদি নারীর উপরই বর্তায়। গ্রামের নারীরা দুর্যোগকালে পরিবারকে খাদ্য নিরাপত্তা দেয়ার পরিকল্পনা করে। খাদ্য সংগ্রহ কঠিন কাজ হলেও তারা তা করে থাকে। নারীরা নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে পারলেও যৌন হয়রানির শিকার থেকে বাঁচতে অসমর্থ্য। উদ্বাস্তু মহিলারা আশ্রয় কেন্দ্রে যাবার পথে বা আশ্রয় নারী সব সময় বেঁচে থাকার জন্য দুর্যোগের আগে দুর্যোগকালে ও পরে সৃজনশীল, কষ্টকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বেশী বৈষম্যের শিকার হয়। দুর্যোগের সময় শিশু ও বৃদ্ধের সাথে তারাই আবার বেশী নিহত হয়।

দুর্যোগ কাজে জেন্ডার বিবেচনা ঃ

দুর্যোগ কাজে বিশেষতঃ দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী শক্তিশালী করতে হলে জেন্ডার চাহিদা বিবেচনা করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে আলোচনার প্রয়োজন হবে। সুপারিশগুলো হচ্ছেঃ

- দুর্যোগ ও পরবর্তী কর্মসূচীতে নারীসহ সমাজের সকলের অংশগ্রহণ।
- দুর্যোগ অবস্থা থেকে সর্ব প্রথম শিশু ও নারীদের উদ্ধার করতে হবে।
- প্রত্যেক গৃহ প্রধানের জরুরী আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানা থাকতে হবে, যাতে প্রত্যেকেই জরুরী অবস্থায় সহজে সেখানে পৌঁছাতে পারে।
- দুর্যোগকালে পরামর্শ, যোগাযোগ, স্থানান্তর ও সমাজকে সংগঠনের কাজে মহিলাদের সংযুক্ত করতে হবে।
- পানি সরবরাহ এবং নলকূপের হেফাজত আশ্রয় কেন্দ্রের প্রত্যেকের জানা থাকতে হবে।
- সম্পত্তি বাড়িঘর, মানুষের জীবন বিশেষতঃ নারীর জীবন রক্ষায় সমাজের ভিতর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।
- জরুরী কাজে স্থানীয় কর্মী, যেমন-স্কুল শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী, মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দানে সরকারের সহযোগিতা।

১। আমলতান্ত্রিক ধারা বাদ দিয়ে দেশ/সরকারকে প্রতিটি ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে দুর্যোগ কাজে দ্রুত সাড়া দেয়ার পরিকল্পনা করতে হবে।

২। দুর্যোগের সময় নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সাড়া দিতে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দপ্তর, এনজিও এবং সামরিক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে দ্রুত ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। বিশেষভাবে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে যাতে নারী প্রধান পরিবারের লোকজন সাহায্যের ন্যায্য অংশ পেতে পারে।

৩। পুনর্বাসন কাজে স্থানীয়ভাবে মহিলা গ্রুপকে পুনঃ সক্রিয় করতে হবে। দুর্যোগ কর্মসূচী নারীদের উপযোগী হতে হবে যাতে শিশুদের যত্নের প্রয়োজনীয় সুবিধা, টয়লেট সাধারণের ব্যবহারের স্থান উঁচু করার পরিবর্তে বাড়ির ভিটা উঁচু করার ব্যবস্থা।

৪। নিশ্চিত করতে হবে যে, পুনর্বাসন কাজে আর্থিক ও সামাজিক সম্মান পুনঃস্থাপন কাজে নিয়োজিত না হয়। পুনর্বাসন কাজ করতে হবে সবচেয়ে দুর্বলতম অংশে মহিলাদের জন্য।

৫। পুনর্বাসন কাজ এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা পূর্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান থাকে আরো শক্তিশালী হতে পারে, বিশেষ করে মহিলাদের অবস্থান উন্নত করতে হবে।

৬। দাতা সংস্থার ব্যাপক পুনর্বাসন কাজে নারীদের বিশেষ চাহিদা মিটানোর জন্য সুযোগ ও অপরাপর ব্যবস্থা থাকতে হবে। মাটির কাজে নারী ও পুরুষের মজুরী সমান হতে হবে। গৃহ সংস্থান প্রকল্পের উদাহরণ টানা যেতে পারে।

৭। আশ্রয় কেন্দ্রে এবং ক্যাম্পে এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিৎ যাতে মহিলাদের উত্তেজিত করার সম্ভাবনা কমানো যায়। যেমন–পর্যাপ্ত আলো, পর্যাপ্ত টয়লেট, খাদ্য ও পানীয় জলের জন্য সহজ ও নিরাপদ ব্যবস্থা, রান্নার কাজে নিয়োজিত মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহায়তাকারী।

৮। সরকার, এনজিও বা দাতা সংস্থা পরিচালিত ত্রাণ ও জরুরী সহায়তা কাজে উদ্বুদ্ধ ও নিবেদিতা মহিলাদের চিহ্নিত করা এবং যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে দুর্গত নারীদের অসুবিধা ও চাহিদাগুলো ভালভাবে দেখাশুনা করতে পারে।

৯। নতুন নতুন সমস্যা ও চাপের বিষয়ে পরিবারগুলোকে পথ প্রদর্শন করতে হবে। আহতদের সান্ত্বনা দিতে হবে। যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জলোচ্ছ্বাসের দুঃস্বপ্ন, সন্তান বা পরিবারের অন্যান্য সদস্য হারানোর বেদনা, আশাহীনকে আশার সঞ্চার, গৃহহীনদের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সান্ত্বনা দিতে হবে। প্রয়োজনে পরামর্শের জন্য স্থানীয় লোকজনের সাহায্য করা যেতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জেন্ডার বিষয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার (সরকার/এনজিও/দাতা) মহিলা কর্মীদের উদ্দীপনার সাথে আদর্শ কর্মী হিসাবে কাজ করে। তথ্য জ্ঞাপন ও উচ্চ পর্যায়ের সভায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিতে হবে। সরকারকে নারী পুরুষের বিভেদ দূর করে সমতা আনতে নীতি ও কর্মসূচী পরিকল্পনার স্তর থেকেই উদ্যোগী হতে হবে। কর্মসূচীর কার্যকারিতা ও দক্ষতা ব্যাপকভাবে বাড়ানোর সম্ভব যদি পরিকল্পনা পর্যায়ে নারীদের সংশ্লিষ্ট রাখা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সেবামূলক কাজ এমনভাবে বিন্যাস করা উচিৎ যাতে নারীর কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হয় এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামে তারা দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও নারীর ক্ষতি করার প্রবণতা রোধ করতে পারলে জরুরী কর্মসূচিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

দুর্যোগে নারীদের বেশী ঝুঁকির কারণসমূহঃ

- শিশুদেরসহ নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া
- অন্তঃসত্ত্বা
- সামাজিক নিরাপত্তার অভাব
- সচেতনতার অভাব
- পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা
- সিদ্ধান্তহীনতা
- পরিবার ও সংসারের জিনিস পত্রের উপর বিশেষ আকর্ষণ
- অদৃষ্টবাদীতা

দুর্যোগে নারীদের সক্ষমতা ঃ

- প্রবল মানসিক প্রস্তুতি / শক্তি
- পরিবারের জিনিসপত্র রক্ষায় অধিক সামর্থ / আগ্রহী
- সমুদ্রের মত গভীর ধৈর্য্যশীলতা ও সহনশীলতা
- ভাল স্বেচ্ছাসেবিকার ভূমিকা পালন

- সেবা, রান্না করা, শিশুর যত্ন, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য মহিলাদের সংগঠিত করা।
- খাদ্য মজুদে স্থানীয় জ্ঞান, জ্বালানি, সংগ্রহ, পানি, হারিয়ে যাওয়া পশু পাখী উদ্ধার।

দুর্যোগে নারীদের বিপদাপন্নতা কমানো এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পদক্ষেপ সমূহঃ

- দুর্যোগ কালীন ও পরবর্তী কর্মসূচীতে নারীসহ সকলের অংশগ্রহণ।
- পরিবারের নারী ও পুরুষ সকলকে জরুরী আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানা থাকতে হবে।
- দুর্যোগকালে পরামর্শ, যোগাযোগ, স্থানান্তর ও সমাজকে সংগঠনের কাজে মহিলাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
- সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা যেমনঃ আশ্রয় স্থল, পানি সরবরাহ, স্থান, স্থানীয় চিকিৎসা সুবিধা সকলকে জানতে হবে।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।
- জরুরী কাজে স্থানীয় কর্মী হিসাবে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা।
- জরুরী আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নারীদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তৈরী করতে হবে যেমনঃ টয়লেট, থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি।
- আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলা স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা।
- সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নারী ও পুরুষের সমভাবে অংশগ্রহণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রগুলো লোকালয়ের কাছাকাছি নির্মাণের ব্যবস্থা।
- সকল ধরনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নারী পুরুষের মিলিত কমিটি/দল তৈরি করতে হবে। যেমনঃ পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, জরীপ কমিটি গঠন, বিতরণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
- দক্ষতা ও যোগ্যতা বিবেচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন্টন করতে হবে।

দুর্যোগে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক বিষয় ঃ

- সচেতনতা বৃদ্ধি
- প্রাথমিক চিকিৎসা
- পরিবারের দুর্যোগ প্রস্তুতি
- সমাজ সংগঠন
- পরিকল্পনা
- যোগাযোগ

জরুরী প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারী ঃ

১। দুর্যোগকালে নারীর অভিজ্ঞতা পুরুষের চেয়ে বিভিন্ন

২। দুর্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষায় নারীর অসহায়ত্ব ও ক্ষমতা পুরুষের সামাজিক অবস্থানের কারণে ব্যাপকভাবে ভিন্ন।

৩। দুর্যোগের প্রভাব নারী ও পুরুষের উপর ভিন্ন হয় এবং নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে।

৪। যদিও নারীরা দুর্যোগের আগে, দুর্যোগ চলাকালে ও দুর্যোগের পর বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সৃজনশীল ভূমিকা পালন করে কিন্তু সামাজিক অবস্থানের কারণে তাদের প্রতি অবিচার করা হয় এবং দুর্যোগের বোঝা তাদেরই বহন করতে বাধ্য করা হয়।

৫। উল্লেখ না করলে চলে না যে দুর্যোগে নারী ও শিশুরাই বেশী নিহত হয়। যদিও চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অনেক কিছুর মত জরুরী প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য নিবেদিত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বৈশিষ্ট্য ও সম্পদই হচ্ছে এর জনগণ বিশেষতঃ নারী। দেশটির জনগণ নিয়মিত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলা করছে–দুর্যোগ বা অন্য দেশকে তাদের পাশে নিয়ে আসে। দরিদ্র বাংলাদেশের জনগণ যোগ্য মানব সম্পদ। সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ও বাইরে ক্ষমতার ভারসাম্য পুনঃবিন্যাস করতে হবে। এইজন্য মূল্যবোধ, বোধগম্যতার পরিবর্তন এবং ঐতিহাসিকভাবে নারীর অসুবিধাজনক অবস্থানের পরিবর্তন করতে হবে। নারী ও পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সকল পক্ষের (সরকার/এনজিও/দাতা/সমাজ) এক যোগে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রয়োজনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পুনঃবিন্যাস করতে হবে।

*সূত্রঃ ** ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট,কেয়ার বাংলাদেশ এর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়িকা এর "জেন্ডার ও দুর্যোগ" থেকে সংগৃহিত।*

ছবিগুলি ২৫মে'২০০৯ দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় আইলা'র সন্তানহারা, গৃহহারা, পানীয় জলের সংকট ও দুর্যোগের পর বেঁচে থাকার তাগিদে "ক্যাশ ফর ওয়ার্ক "এর কাজে নারীদের অংশগ্রহণ।